হইতে তাড়িত হইয়া তাঁহাকে অরণ্য সার করিতে হইয়াছে। পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য তিনি অম্লানবদনে সর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। যে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের অপেক্ষাও গরীয়সী, তদুভয়ই তাঁহাকে বহুকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তথাপি তিনি সুখী। রাজ-প্রাসাদ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বৃক্ষমূল অবলম্বন করিয়াও তিনি মনের সুখে দিনাতিপাত করিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কিসের দুঃখ? সঙ্গে যাঁহার ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, সঙ্গে যাঁহার ত্রিলোকদুর্লভা জানকী, তাঁহার দুঃখ কিসের? জানকীর সুগভীর প্রণয়-সাগরে তিনি সর্ব্বদুঃখ বিসর্জ্জন করিয়াছেন—জানকীর প্রণয়ে তিনি ভীষণ দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিয়াও অক্ষুব্ধ-হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অচিরে দুর্ভাগ্য রামের কপাল ভাঙ্গিল। তাঁহার জীবনের একমাত্র সুখ জানকী, বিধাতা সে সুখেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন। সোণার হরিণ দেখিয়া সীতা মুগ্ধ হইলেন। রাম লক্ষ্মণ সেই হরিণ ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ইত্যবসরে কপট চোর রাবণ তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিল। রাম প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন তাঁহার কুটীর শূন্য। সীতা কোথায়? তাঁহার সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী জানকী কোথায়?—রামের সীতা চুরি গিয়াছে। রাম নিঃসহায়, ভিখারী। নিঃসহায় রামের সহায় হইয়া সীতা উদ্ধার করিবে কে?

কেন, সীতা উদ্ধারের জন্য ভাবনা কি? সূর্য্যবংশের মূর্ত্তিমতী সুকৃতি, ভারতভূমির বহুকাল সঞ্চিত পুণ্য ফল-রূপিণী সীতাদেবী রাবণের হস্তে পড়িয়াছেন—এ কথা শুনিয়া কোন্ বীর-হৃদয় না নাচিয়া উঠিবে? সূর্য্য-কুলবধূ লঙ্কায় আবদ্ধা রহিয়াছেন, এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য কে না অম্লানবদনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবে? হনুমান্, জাম্বমান্, নল, নীল প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের বীরশ্রেষ্ঠগণ সীতা উদ্ধারের জন্য স্বদলে সমাগত হইতে লাগিলেন। কবির প্রতিভাবলে ইঁহারা এক প্রকার অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা এক্ষণে ইঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সীতা উদ্ধার সম্বন্ধে এক জীবের অধম জীবের আখ্যায়িকা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বীরগণ ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া অবশেষে সমুদ্র উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে উত্তাল তরঙ্গায়িত দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র অতিক্রম করা আবশ্যক, নচেৎ সমুদয় আয়োজনই বৃথা। বীরগণ দেখিলেন যে যদি সমুদ্র বন্ধন করিতে পারা যায়, তবেই মঙ্গল, নহিলে সীতা উদ্ধার চেষ্টা সকলই বিফল হইবে। সুতরাং রাম ও তাঁহার অনুচরবর্গ অনুক্ষণ এই চিন্তাতেই ব্যস্ত রহিলেন। অচিরে ইহারও উপায়োদ্ভাবন হইল। বিশ্বকর্ম্মা-তনয় নল সেতুবন্ধন দ্বারা অজেয় অলঙ্ঘ্য সমুদ্রকে স্বায়ত্ত করিবার মানস করিলেন, এবং বীরগণ মহোৎসাহে সেতু বন্ধনোপযোগী সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিশ্বকর্ম্মা-তনয়ের বুদ্ধি বলে সমুদ্রে শিলা ভাসিতে লাগিল। বীরগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেতু বন্ধনে ব্যাপৃত রহিলেন।

'প্রসিদ্ধনামা মহাতেজা বীরগণ সীতার উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তবে কি ইহাতে দুর্ব্বলের করণীয় কিছুই নাই? যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা উচিত?' জীবের অধম এক ক্ষুদ্র কাট বিড়াল এই কথা এক দিন মনে মনে ভাবিল। অবশেষে তাহার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল যে জানকীর জন্য—আত্ম বিসর্জ্জন জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সত্য সে অতীব দুর্ব্বল প্রাণী, তাহার ক্ষমতা অতি অল্প, তথাপি ঈশ্বর তাহাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তদনুযায়ী চেষ্টা কি বলিয়া সে না করিবে? না করিলে সে ধর্ম্মে পতিত হইবে। কাট বিড়াল এইরূপ তর্ক করিয়া আত্মীয় কুটুম্বের সহিত রামের সেতু বন্ধনে সহায়তা করিতে চলিল।

কাট বিড়াল সেতু বন্ধন করিতে চলিল, কিন্তু কি করিলে রামের উপকার করা হয়, ইহা সে শীঘ্র স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অনেক ক্ষণ পরে সে একটী পন্থা অবলম্বনের মানস করিল। সেতু বন্ধনের জন্য জলের প্রয়োজন। কাটবিড়ালগণ সকলে একত্রিত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইতে লাগিল, এবং তৎপরে সেতুর উপরে গিয়া আপনাদের দেহ ঝাড়িতে লাগিল। কেহ কেহ বা বালুকার উপর শরীর লুণ্ঠিত করিয়া গাত্রস্থ ধূলা সেতুর উপর

ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইল। এই কার্য্য তাহারা অবিরত করিতে লাগিল। গুণগ্রাহী রামচন্দ্র অবজ্ঞা না করিয়া তাহাদের সেই যৎসামান্য সহায়তা সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অবশেষে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

ইহাকেই কাট বিড়ালের সেতু বন্ধন কহে। পাঠিকা! এই গল্পটি আমরা শৈশবাবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত কতবার যে শুনিয়াছি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এই সামান্য গল্পের মধ্যে যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ লুক্কায়িত রহিয়াছে বোধ হয় তাহা আমরা অনেকেই চিন্তা করি না। এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যদি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারাযায়, তাহাহইলে শত শত নৈতিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে উপকার না হইবে ইহাতে ততোধিক উপকার দর্শিবে। গল্পটী কি উৎকৃষ্ট! কোথায় ক্ষুদ্র হেয় কাট বিড়াল, আর কোথায় বিশাল সমুদ্র ও তাহাতে সেতু বন্ধন। কিন্তু তথাপি কাটবিড়াল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল না। রামচন্দ্রের দুঃখে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ কাঁদিল, সে তাহার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল। এই সংসার-ক্ষেত্রে সত্য ও ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য কত দুষ্কর সেতু বন্ধন আবশ্যক। মহাত্মাগণ এই কার্য্যে ব্রতী হইলেও আমাদেরও কাট বিড়ালের ন্যায় হওয়া উচিত। মনুষ্যের পক্ষে সংসার কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমরা এমন অলস, স্বার্থপর, ও কঠিনহৃদয় যে আমরা অন্যের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হই না, আমাদের অবশ্যকরণীয় কার্য্যে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহি। আমি দুর্ব্বল, আমি সম্পত্তি-বিহীন, আমি স্থূলবুদ্ধি, আমার দ্বারা সংসারের কি উপকার হইবার সম্ভাবনা,—ইত্যাদি কাল্পনিক আপত্তির দ্বারা আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করি। মানিলাম তুমি দুর্ব্বল, তুমি সম্পত্তি-বিহীন, তুমি স্থূলবুদ্ধি। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন? তোমার দ্বারা জগতের কতটুকু উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই; ঈশ্বর তোমাকে যে পরিমাণে ক্ষমতা দিয়াছেন, তুমি তাহার সদ্ব্যবহার করিলে কি না তাহাই দেখ। তাহা যদি না করিয়া থাক, তবে তুমি অবশ্যই ঈশ্বরের নিকট অপরাধী;

এবং সেই অপরাধের যদি মার্জ্জনা চাও, তাহাহইলে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যথাসাধ্য জগতের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হও।

কৌতুক কথা।

আমেরিকার এক জজ কোর্টের এক স্ত্রীলোক বারিষ্টারকে বলেন "সন্তান প্রসব করা আপনাদিগের কার্য্য, আদালতে বারিষ্টারী করিতে কেন আসিয়াছেন?" রমণী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আপনার ন্যায় সন্তান প্রসব করা অপেক্ষা যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাই নারীর পক্ষে গৌরবের বিষয়।"

এক বাটীর কর্ত্তা বড় ধার্ম্মিক, লোকের প্রতি দুর্ব্বাক্য বলিতে বা দুর্ব্যবহার করিতে জানেন না। বাটীর দাসী প্রতিদিন দুধ হইতে সর চুরি করিয়া খায়। ইহা জানিতে পারিয়া একদিন দাসী যখন চুরির অভিপ্রায়ে রন্ধন শালায় প্রবেশ করিয়াছে, তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে গমন করিলেন এবং সর চুরি করিতেছে দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কঠোর বাক্য না বলিয়া ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা তাহাকে অনুতাপিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন "দেখ বাছা! আমাকেই যেন তুমি ভয় কর না, কিন্তু উপরে কে একজন আছেন তাহা জান, যিনি সব জানিতে পারেন, যাঁহার নিকট আমি কীটানুকীট।" দাসী অপ্রতিভ না হইয়া বলিল "আজ্ঞে তা জানি তিনি গিন্নি মা।"

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৮ জুলাই হইতে দার্জিলিং পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে খুলিয়াছে। এখন কলিকাতা হইতে রেল গাড়ীতে চড়িয়া একবারে হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশে উপনীত হওয়া যায়।

২। বোম্বাইয়ে সম্প্রতি গুজরাটী বেনিয়া জাতির মধ্যে একটী বিধবা বিবাহ হইয়াছে, তত্রত্য শতাধিক সম্ভ্রান্ত লোক বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। বরের নাম

বোয়ানজি গোবর্দ্ধন, কন্যার নাম বাই মানকোর।

৩। গত ১লা আগষ্ট বঙ্গমহিলা সমাজের জন্ম দিন উপলক্ষে মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে বিশেষ উৎসব হয়। সভ্যাগণ ব্যতীত কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভারম্ভে প্রথমতঃ একটী সঙ্গীত হয়। তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত স্বর্ণপ্রভা বসু সংক্ষেপে একটী প্রার্থনা করিয়া সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ইউরোপীয় শ্রোতৃগণের বোধসৌকর্য্যার্থ বাবু আনন্দ মোহন বসু তাহার মর্ম্ম ইংরাজিতে প্রকাশ করেন। পরে অন্যতর সম্পাদিকা কুমারী কাদম্বিনী বসু একটী উৎসাহকর প্রস্তাব পাঠ করেন। অতঃপর কয়েকটী বালিকা গ্রন্থোদ্ধৃত কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব মৌখিক আবৃত্তি করেন। মধ্যে মধ্যে ও সর্ব্বশেষে সঙ্গীত হয়। অবশেষে জলযোগ হয় এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি প্রদর্শন হয়। উপস্থিত সকলেই এই উৎসবে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

৪। চট্টগ্রামে একটী বৃহদাকার সর্প ছাগল গিলিতেছিল, এমত সময়ে তাহাকে মারিয়া ফেলা হয়। আলীপুরের পশু শালায় এতবড় সর্প আসে নাই।

৫। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মহাত্মা গ্লাডষ্টোন যেমন উদারচেতা, তাঁহার পত্নীও সেইরূপ। তিনি সাধারণের উপকারার্থ হাওয়ারডন নামক গ্রামে একটী অনাথনিবাস ও একটী কফি হাউস স্থাপন করিয়াছেন।

৬। পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন আমেরিকার লোকে খড় জমাট করিয়া এরূপ কাষ্ঠ ও তক্তা প্রস্তুত করিতেছেন যে তাহা চাঁচিয়া মসৃণ করা যায় ও তাহাতে প্রেক পোতা যায়, তাহা রসে না এবং তাহাতে জল ঢালিলে একপিঠ হইতে অন্যপিঠ ফুঁড়িয়া বাহির হয় না।

৭। বিছা কামড়াইবার কয়েকটী ঔষধ প্রকাশিত হইয়াছে:—(১) কেরোসিন তৈল ক্ষত স্থানের উপর কয়েক মিনিট মালিস করিতে হয়। (২) এক খণ্ড ফটকিরী আগুন তাতে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানে ধরিলে অতি শীঘ্র আরাম হয়। (৩) তেঁতুল ও লবণ একত্র বাটিয়া ক্ষত স্থানে মাখিতে হয়। (৪) ক্লোরোফরমও সেবন করিলে উপকার হয়।

৮। গত ১২ই ভাদ্র বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক সভা সিটি কলেজ ভবনে অতীব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে বিক্রমপুরের পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলা ও বালিকাদিগকে অনেকগুলি পারিতোষিক প্রদান করা হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবে এবার এ সভার কর্য্যের বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর ৪র্থ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—আমরা অনেক দিন এই বিবরণ পাইয়াও হস্তান্তরিত থাকাতে ইহার সমালোচনা করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি। এই সভার ৩টি উদ্দেশ্য (১) শ্রীহট্টবাসী ছাত্রদিগের আত্মোন্নতি ; (২) তাহাদিগের মধ্যে ঐক্যবন্ধন ; (৩) সাধ্যানুসারে শ্রীহট্টের হিতসাধন। এই সকল বিষয়ে সভা অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। স্ত্রীশিক্ষা বিধান সভার একটী প্রধান কার্য্য। অন্তঃপুরস্থ মহিলা ও বালিকাদিগের শিক্ষা ৫টী শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া তাহার পরীক্ষা হয়। ১১৮ জন পরীক্ষার্থিনীর ৯৭ জন পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে ৭৭ জন প্রথম ও ২০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৩৫ জন সধবা, ১০ জন বিধবা, ৪৬ জন অবিবাহিত। কলিকাতায় ইঁহাদিগের পুরস্কার বিতরণ কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভা হইতে ন্যাসন্যাল ইনষ্টিটিউসন নামে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় শ্রীহট্টে স্থাপিত হইয়া অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতির পরিচয় দিয়াছে। সভা হইতে কয়েকটী যুবক স্থানে স্থানে জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচারাদিরও সহায়তা করিয়াছেন। সভার বার্ষিক মোট আয় ২৭৭৮৵০ ও ব্যয় ২০৮৷৶৫ হইয়া ৬৯৷৵১৫ হস্তে স্থিত আছে। শ্রীহট্টের যুবকগণ আপনাদিগের আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার দ্বারা যে মহৎকার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা দেশহিতৈষী মাত্রেরই অনুরাগভাজন হইয়াছেন।

২। কণ্ঠসঙ্গীত ১ম ভাগ—শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ঘোষাল কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ৵১০ আনা। বিনা গুরূপদেশে সঙ্গীত শিক্ষা হয় এই উদ্দেশে গ্রন্থকার ইহা প্রচার করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

সুখ স্বপ্ন।

আইল রজনী সঙ্গি-গণ-লয়ে
দেখাতে আপন শোভা,
ফিরে কি নয়ন সে শোভা নেহারি,
ভাবুকের মনো লোভা। ১

কিবা মনোহর রজনী সুন্দর
সুন্দর শশাঙ্ক কোলে,
যেন মরি হায় কৌস্তুভের মণি
ঝলসে মাধব গলে। ২

ঘুমঘোরে ঢলি পড়য়ে সকলে
তোমার মায়ার বশে,
তব যাদু মন্ত্রে হারায়ে চেতন
পড়য়ে তোমার ফাঁসে। ৩

চাপিয়ে রজনী ধরিল যে মোরে
ফেলিলে শয্যার পাশে,
ঘুমে অচেতন, কি দেখিনু হায়
কি সুখ হৃদয় বাসে! ৪

দেখিনু স্বপন অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব
ভাবেতে হইয়ে ভোর,
বিহ্বল হইনু সুখের নেশায়
বাড়য়ে নেশার ঘোর। ৫

সহসা কেনরে উঠিনু চমকি
চারি দিক পানে চাই,
নয়ন ফিরায়ে সুখের স্বপন
নাহিক দেখিতে পাই। ৬

না জানি নিশায় কতইরে সুখ
ভুঞ্জিনু অপার হায়,
নিদ্রায় থাকিয়া সহসা কেনরে
চমক ভাঙ্গিয়া যায়। ৭

হয় যে হৃদয়ে ব্যথার সঞ্চার,
জাগিয়া প্রাণ যে জ্বলে,
মর্ম্মের পীড়নে হইনু অধীর,
ভাসিনু নয়ন জলে। ৮

ভাবিনু আমার হৃদয়ের সুখ
মরি কে কাড়িয়া নিল,
অন্ধকারময় দেখিনু সকল
হায় হায় একি হোলো। ৯

এ বসুধাময় ঘুরিয়ে আবার
পুন কি দেখিব হায়,
স্বপনের ধন, অপূর্ব্ব রতন,
মন যে উদাসী তায়! ১০

এই মত ভাবে হয়ে অচেতন
নাহি কোন সুখ মনে
গেলরে রজনী প্রিয় শশি লয়ে
চাহিনু আকাশ পানে। ১১

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল,
হইল অরুণোদয়,
সুখের স্বপন অস্তাচলে গেল,
জগৎ আঁধারময়। ১২

শ্রীমাতঙ্গিনী।

A VISIT TO HATFIELD HOUSE.

(Contributed by an English Lady.)

ON a fine Summer afternoon in July, a party of English ladies and Indian and English gentlemen started by train from London on an excursion to Hatfield, which is a small country town about 20 miles from the Metropolis and is reached in about an hour. The journey was a pleasant one, for when the outskirts of London were passed, the country looked extremely pretty, the fields of grass were just beginning to be cut, and the hay to be made; beautiful dog-roses were in bloom in the hedges. The corn also was just turning a little golden and giving good promise for the future harvest. The Railway often crosses a beautiful river which much improves the scene. Indeed it was quite the ideal of an English Country Landscape. The Alexandra Palace was soon passed which is much used for concerts and flower shows, also many fine displays of fire works are given there. The palace contains some nice pictures and statuary and many shops, but it is not so interesting as the Crystal Palace at Sydenham. Then we came to Hornsey with its old church, all covered with ivy. In the church-yard is buried the celebrated English poet Rogers.

Barnet and South mimes being passed the train soon arrived at Hatfield. The party after a short time having all collected and being joined by a few more people, proceeded to an Inn, called the Red Lion, where a nice luncheon was served. After every one had partaken of it, a start was made to see the "Old House." The present house was built in the year 1611 by Sir R. Cecil afterwards Earl of Salisbury, but the gate way and west end of the house, which are still standing, are the remains of a much older one in which Queen Elizabeth when she was Princess resided, or in fact was kept in custody, during the reign of her sister Mary. The trunk of the old oak is to be seen in the park under which Elizabeth was sitting when she heard she was Queen of England in consequence of Mary's death. The house still belongs to the Marquis of Salisbury and he and his family often live there; he is very kind and allows the house to be shewn to visitors when he is not at home. We first enter a marble dining hall with a large table, chairs, and other furniture, and an immense fireplace in which huge logs of wood are used to be burnt. There are some fine portraits on the walls, of Queen Elizabeth and Mary of Scots, taken just before her death and of Mary Queen of England and her husband Philip. This hall is now used when the Marquis gives grand dinner parties to distinguished guests. We now come to the armoury; at one end of the hall, is a grand gilt brazier given to the Marquis by the Sultan of Turkey in 1876. The view from one end to the other of this long but narrow hall is most beautiful and grand.

We now come to the private chapel which is very pretty, and has comfortable seats covered with red velvet. Some of the painted glass windows in it are very old. They are beautifully painted with Scripture subjects. There is some fine oak carving in the chapel, but it is only a small place. We then went up a fine oak stair-case, which had to be ascended with care as it was so very slippery, and entered the bedrooms which are large and spacious and communicate with one another. Most of them are named from the wood work in them, such as the oak dressing room, and bed room, and the Walunt bed room in which the grandmother of the present Marquis was burnt to death in 1835, when quite an old woman, in consequence of the plumes she wore taking fire, and the whole of this wing of the house was burnt down. There is a portrait of her as a beautiful child in this room, and from here a fine view is seen over the long walk in the garden with rows of beautiful trees on both sides. We then passed to the long gallery which is 160 feet long and is very fine, the roof is magnificent being richly gilt, the floor is of oak and beautifully polished. It is sometimes used as a ball room, but when the Marquis and family are at home, it is their morning sitting room. There are interesting pictures on the walls, of the Kings of England.

We were then shown the library, in which there are a great many books some of them very rare; albums and photographs, chess and draught boards were lying on the tables. From the windows of this room, the private garden is to be seen laid out in the old fashioned style of Queen Elizabeth, in little beds of flowers with narrow gravel walks between. At the corners of the garden are four mulberry trees planted by James the first. We next came to the winter dining room with its great fire-place, which is very necessary in this cold climate when the snow is sometimes on the ground for more than a week together. There are many historical pictures in this room of great interest. In a small hall near was shown a wooden cradle in which Queen Anne slept when an infant. It is very roughly made and does not look at all comfortable. A village child would have a better cradle in these days. But we must remember, this was made in the 17th century and everything has much improved since then.

We visited a pretty suite of rooms beautifully furnished and kept in readiness for the Prince and Princess of Wales who sometimes visit the Marquis. Here was the bed room occupied by her Majesty the Queen and the Prince Consort when they visited the house in 1846. The bedstead is covered with a splendid counter-pane, richly embroidered with gold on velvet. In the dressing room are portraits of the Queen and Prince Consort drawn in pencil, taken while they were staying here. We next saw James 1st bed room, the bed on which he used to sleep, the chest of drawers, the old arm chair and other chairs he used to use. We then entered King James' room, or the winter drawing room. This is the best furnished room in the

house and contains a great number of curiosities. Some relics of old times kept in a glass case, such as the first pair of hand knitted stockings worn in England by Queen Elizabeth, a crystal faced watch of the time of James 1st, and Queen Mary's string of diamonds. There were some beautiful Cashmere table-covers and many handsome things from India, China and Japan. We descended to the ground floor by another handsome oak stair-case. Then we went to the yew room, where there is a very curious portrait of Queen Elizabeth in a dress covered with peacock's feathers, eyes and ears, and serpents, emblematic of her various qualities; meaning that she was as proud as a peacock, cunning as a serpent, and all eyes and ears because she could not be deceived, she is holding a rainbow as a pledge of peace.

Lastly we visited the charming sitting room of Lady Salisbury. It contains beautiful furniture; among other things a handsome silver box of Indian workmanship given by Lord Lytton as a Christmas present to Lady Salisbury. We then came again into the armoury having made the tour of the house. We went into the Park which is very fine. There are splendid avenues of trees some of them being limes which were just in blossom and gave a lovely scent to the air. We soon left the avenue and turned into a path that led us through the fern and brought us out just opposite the old oak, where Queen Elizabeth was when she heard of her sister's death. There is only the trunk remaining, the tree is quite dead. We then proceeded towards the grove and stood on the sloping bank of a river from which we had a splendid view. This ended the day's excursion. We walked slowly to the station and we were soon in the train which took us all back to London after having had a very pleasant day in the country.—Ͻ. T., *July* 1881.

Italy is following the example of England in promoting the higher education of women. Two Italian ladies, the Sigrorine Evangelina Battero and Carolina Magistrelli, have lately obtained University degrees in Physical Science and their theses written for the degrees have been printed. We learn moreover, that, whereas an attempt to form a girls' class for the study of Latin, only three years ago, provoked a storm of sarcastic criticism in the liberal papers of Rome, these late successes achieved by women have been announced by the Italian papers with the same satisfaction that Miss Scott's success in the Mathematical Tripos excited in the English Press.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০১ সংখ্যা। } আশ্বিন ১২৮৮—অক্টোবর ১৮৮১। { ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পশ্চিম বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য একমাত্র হিতকরী সভা আছে এবং তাহাদ্বারা সমূহ উপকার হইতেছে। কিন্তু সেরূপ সভার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না, ইহা নিতান্ত দুঃখ ও নিরাশার বিষয়। যাহাহউক আমাদিগের সান্ত্বনা ও আনন্দের বিষয় এই আমাদিগের পূর্ব্ব বাঙ্গালার বন্ধুগণ এ বিষয়ে অতি উৎসাহকর সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ঢাকা, শ্রীহট্ট, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি জেলার নারীহিতৈষী মহোদয়গণ এক একটী সভা সংগঠন করিয়া স্থানীয় নারীগণের শিক্ষাবিধানে বিশেষরূপে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। ঢাকার বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশনের বিষয় আমরা গত সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি, এই সভার কার্য্য বিবরণ যেরূপ উপাদেয়, তাহাতে পাঠিকাগণ স্বয়ং তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, আমাদিগের অনুরোধ। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। স্ত্রীশিক্ষা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনে সভা নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। গত বৎসর ৩টী বালিকা-বিদ্যালয় ইহার যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম বৎসর ৭টী বালিকা-বিদ্যালয় সভার তত্ত্বাবধানে ছিল, এবৎসর তাহার সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে।

সভা ১০টী বিদ্যালয়ে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দিয়াছেন। ইহাহইতে পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ও একটী পরীক্ষা প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর ৩১১ জন পরীক্ষার্থিনী হন, তন্মধ্যে ২০২ জন পরীক্ষা দেন এবং ১৮১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিক্রমপুরের ৩৭টী গ্রাম হইতে পরীক্ষার্থিনীর নাম গৃহীত হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণাদিগের মধ্যে সধবা ৯১, বিধবা ১০ ও কুমারী ৮০ জন। ইঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতীয়, ৫ জন নিম্ন শ্রেণীস্থ, ৩২ বৎসরের মহিলা পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিয়াছেন। ধাত্রী-বিদ্যা, শিল্প, গৃহচিকিৎসা প্রভৃতির বিশেষ পরীক্ষাও গৃহীত হইয়াছিল। সভার গত বর্ষের আয় ৪৯৬৸৶০ এবং ব্যয় ৩৮৫৸৫ হইয়া স্থিত ১১১৷৴১৫ আছে। সভার সাহায্যার্থ দুইটী বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইলাম। ইহার মধ্যে বাবু দুর্গামোহন দাস তাঁহার পরলোক-গতা সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ীর স্মরণার্থ "ব্রহ্মময়ীবৃত্তি" নামে মাসিক ১০ টাকার একটী বৃত্তি দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি বিক্রমপুর সম্মিলনীর সদ্দৃষ্টান্ত জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে অনুসৃত হইবে, তাহা-হইলে সমুদায় বঙ্গদেশে অল্পকাল মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত উন্নতি দৃষ্ট হইবে। স্ত্রীজাতির উন্নতির পথ প্রসারিত হইলে সমুদায় সমাজ যে উন্নত হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য।

হিন্দুদিগের অধিকাংশ মেলায় পুরুষদিগের আধিপত্য, কিন্তু কাজলী নামক একটী মেলা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হইয়া থাকে, তাহাতে স্ত্রীলোক-দিগের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রতিবর্ষে ১লা ভাদ্র এই উৎসব হয় এবং শস্যোৎপত্তি এই মেলার উপলক্ষ। শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে প্রত্যেক গৃহের কর্ত্রী কতকগুলি দোনা অর্থাৎ পত্ররচিত পাত্রে গম ছড়াইয়া দেন, তৎপরে উহাদিগকে ছায়ায় রাখেন। বীজ অঙ্কুরিত হইলে সূর্য্যের আলোক লাগিয়া তাহা অপবিত্র না হয়, এজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং প্রত্যেক দিন সায়ংকালে তাহাতে জল সেচন করেন। দশদিন পরে অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন একটী পিত্তলের পাত্রে দোনাগুলি সাজাইয়া একটী স্ত্রীলোকের মাথায় দেওয়া হয়। প্রত্যেক গৃহ হইতে

স্ত্রীলোকগণ এইরূপে সজ্জিত হইয়া মেলাস্থানে একটী বৃক্ষতলে গমন করেন। সেখানে সকলে নানাবিধ সঙ্গীত করিতে করিতে বৃক্ষের চারিদিকে নৃত্য করেন। মেলাস্থলে অনেক পুরুষও সমবেত হয়। তাহারা নিকটস্থ পুষ্করিণীতে সন্তরণ, মল্লযুদ্ধ অথবা অন্যপ্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকে। মেলা দর্শনার্থ বালকেরাও দলে দলে জুটিয়া অনেক প্রকার আমোদ করে। প্রবাদ এই, পুরাকালে বলী রাজা রাজ্যে শস্য কিরূপ হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই মেলার সৃষ্টি করেন। অদ্যাপি লোকের বিশ্বাস সোনার অঙ্কুরিত গাছগুলি যদি সতেজ হয়, তাহাহইলে শুভলক্ষণ, নতুবা দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীলোকদিগের উপাধিদানের নিয়ম করিয়া যে সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ইতিমধ্যে তাহার সুফল দেখা যাইতেছে। ব্রিটিষ আমেরিকার নবস্কোসিয়া প্রদেশের ডালহাউসী নামক কলেজের অধ্যক্ষগণ পুরুষদিগের অধিকার সকল স্ত্রীলোকদিগকেও প্রদান করিয়াছেন।

আমাদিগের মহারাণী যে নিতান্ত প্রাচীন তন্ত্রের মহিলা, তাহা তাঁহার একটী কর্ম্মচারী প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নানাজাতীয় চিকিৎসকদিগের যে সম্মিলন সভা হইতেছে, তাহাতে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিকাংশ সভ্যের মতে সুযোগ্যা স্ত্রীলোক ডাক্তারগণ তন্মধ্যে ভুক্ত হইবার যোগ্য; কিন্তু সার উইলিয়ম জেনার ব্যক্ত করেন, স্ত্রী-ডাক্তার সভাভুক্ত হইলে মহারাণী ইহার (Patron) পালয়িত্রী থাকিবেন না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি এ সংবাদ অমূলক হউক।

বসন্ত রোগে মানবজাতির যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবগত। মনুষ্য-বীজ এবং গো-বীজে টীকা দিয়া এই সর্ব্বনাশ অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য-বীজে টীকা দিয়া যত ইষ্ট তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট; গো-বীজের টীকাও শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ ইষ্টকর নহে। সম্প্রতি আমেরিকার এক চিকিৎসক লেবুর রসের এক আরক

বসন্ত রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহা ঠিক্ ঔষধ হইলে মানবজাতির পক্ষে মহোপকারী হইবে সন্দেহ নাই।

গত লোক সংখ্যা গণনায় সমুদায় ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ২৫ কোটী ২০ লক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশে ৬ কোটী ৮০ লক্ষ, আসামে ৪৮ লক্ষ, মান্দ্রাজে ৩ কোটী ৮ লক্ষ, বোম্বাইয়ে ১ কোটী, ৩৯ লক্ষ, উত্তর পশ্চিমে ৩ কোটী ২৩ লক্ষ, পঞ্জাবে ১ কোটী ৮৭ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশে ১ কোটী ১৫ লক্ষ, ব্রিটিষ-ব্রহ্মে ৩৭ লক্ষ, মহীসুরে ৪১ লক্ষ, রাজপুতানায় ১ কোটী ১০ লক্ষ, মধ্য-ভারতবর্ষে ৯২ লক্ষ, হাইদ্রাবাদে ৯১ লক্ষ, লোক বাস করে; এতদ্ভিন্ন দেশীয় রাজাদিগের অধীনস্থ প্রজা আছে। পুরুষ সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১২ কোটী ৩০ লক্ষ, স্ত্রী সংখ্যা ১১ কোটী ৮০ লক্ষ।

গার্হস্থ-শিক্ষা।

(১৯৯ সংখ্যা ১১৭ পৃষ্ঠার পর।)

পঞ্চম অধ্যায়।

পাক-বিদ্যার ন্যায় আরও দুইটী অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। গার্হস্থ-শিল্প এবং শিশু-পালন। যাঁহাদিগকে গৃহস্থলী আশ্রয় করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে তদুপযোগী শিল্পও কিছু কিছু শিখিতে হইবে, না শিখিলে পরিণামে অনন্ত দুরবস্থা ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। কি জানি, যদি আঢ্য-গৃহিণী না হইয়া দরিদ্র-গৃহিণী হইতে হয়, গার্হস্থ-শিল্প জানা থাকিলে সে অবস্থায় উহার দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। গার্হস্থ-শিল্প অর্থাৎ গৃহস্থলীর উপযুক্ত শিল্প কি কি? তাহা প্রাচীন স্ত্রী-কবির কবিতামধ্যেই গণিত আছে। প্রাচীনকালের গৃহিণীরা কোন বিষয়ই ছাড়েন নাই। বিদেশীয় সভ্যতার প্রাবল্যে এখন আর কোন বালিকাই স্ত্রী-কবিকৃত কবিতা অভ্যাস করেন না; সুতরাং তাহা লুপ্তপ্রায়। আমাদের ইচ্ছা যে, সদুপদেশ-পূর্ণ স্ত্রী-কবিতা সকল স্বদেশ হইতে একবারে

বিলুপ্ত না হয় এবং তদনুরোধেই আমরা মধ্যে মধ্যে ২।৪ টা উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রী-কবিতা উদ্ধৃত করিব।

পুরাতন গৃহিনীরা স্ত্রী মাত্রেরই নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে নৈপুণ্য থাকা উচিত মনে করিতেন এবং তদ্বিষয়ে যাঁহারা বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ও সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন, তাঁহারাই তৎকালের পাকা গৃহিণী। গার্হস্থ-শিল্প অর্থাৎ গৃহস্থলীর আবশ্যক শিল্প কি কি? তাহা ঐ সকল পাকা গৃহিণীর কবিতা মধ্যেই নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যথা—

"হাঁড়ি হান্‌শাল রান্না
তিন নিয়ে ঘর কন্না।"
"পান পানি চূণ
তিন্ গৃহিনীর গুণ।"
"আসন বাসন বসন শায্
লালন পালন মেয়ের কায্।
রাখা ঢাকা শিল্পি-কর্ম্মা
বলে গেছেন রামশর্ম্মা।"

হাঁড়ি—রন্ধনের পাত্রাদি।* হান্‌শাল—হাঁড়িশালা অর্থাৎ পাকগৃহ।† রান্না—রন্ধন। এই কয়েকটীই গৃহিনীদিগের গৃহস্থলী করিবার প্রধান কার্য্য। পাকবিদ্যার অঙ্গ বলিয়া ইহাতে বিলক্ষণ শিল্প সংযোগ আছে। বালিকাকাল হইতে বিশেষ মনোযোগের সহিত শিক্ষা না করিলে, ইহাতে নিপুণা হইবার সম্ভাবনা নাই। অশিক্ষিত অনভ্যস্তা অলসা বাবু রমণীরা এই বিষয়টীর নামেই ভয় পান—কিন্তু যাঁহারা পাকবিদ্যায় সুশিক্ষিতা ও অভ্যাসবর্ত্তী—তাঁহারা ভয় না পাইয়া আমোদ অনুভব করিয়া থাকেন।

পান—তাম্বুল। পানি—পানীয় অর্থাৎ পানযোগ্য জল। চূণ—পানের উপকরণ। কোন গৃহস্থের গৃহিনী কিরূপ গোছাল অর্থাৎ গৃহকর্ম্মে মনোযোগী, তাহা উল্লিখিত তিন দ্রব্যের দ্বারাই জানা যায়। উত্তমরূপে

* কিরূপ পাত্রে কোন্ দ্রব্যের পাক উত্তমরূপে সাধিত হয়, তাহা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, ইত্যাদি।

† পাকশালাস্থ উনান নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য।

তাম্বুল রচনা ও তাহার রক্ষণ করা অমনোযোগিনী বা অলসা রমণীর সাধ্য নহে। সকল গৃহস্থের গৃহে প্রত্যেক দিন বা যখন তখন স্বচ্ছ সুশীতল জল পাওয়া সুসম্ভব নহে।

উত্তম জল জীবনের প্রধান সহায়, ভোগের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। গৃহিণীগণের সর্ব্বদা যত্ন না থাকিলে তাহা যথাসুখে ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। কিরূপ জল পান করা উচিত, কিরূপ জল পান করা অনুচিত, তাহা গৃহিণীদিগেরই জানা আবশ্যক। পানীয় জল সম্বন্ধে যে দুই একটী স্ত্রী-কবিতা পাওয়া যায়—তদ্দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, পুরাতন কালের গৃহিণী নারীরা পানীয় জল সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞা ও মনোযোগিনী ছিলেন। নিন্দিত জল যথা—

"হাটে আনে ঘাটে খায়
শিগ্‌গির শিগ্‌গির অল্লাই যায়।"
শেষানি মিশানি কষানি,
তিন জানি শ্মশানি।

প্রশংসিত জল—

"চাতক জল ফটিক পাণি,
কল্‌সীর মুখে বেঁধো কানি।
আভাঙা জল ঘিয়ের ফুট,
মাটীর পাত্রে করো কুত্।"

হাটে আনে—অর্থাৎ এক বারে অধিক দ্রব্য ক্রয় করে না, যখন যে টুকু প্রয়োজন, তখন সেই টুকু মাত্র বাজার হইতে ক্রয় করে। ঘাটে খায়—অর্থাৎ জল শীতল করিয়া রাখে না, পুষ্করিণী হইতে আনে আর পান করে। এই দুই ব্যক্তি শীঘ্রই অল্লায়ু হয় অর্থাৎ উক্ত উভয় ব্যক্তিই ভোগসুখে সুখী হইতে পারে না।

শেষানি—কলসের তলস্থ অল্পজল। মিশানি—কোন মন্দ অহিতকর বস্তু মিশ্রিত। কষানি—কষায় গুণ প্রাপ্ত। এই তিন প্রকার জল শ্মশানি অর্থাৎ শ্মশানে প্রাপ্তির কারণ। ফল কথা এই যে, উক্ত তিন প্রকার জলে শরীরের অহিত হয়।

চাতক জল—বৃষ্টির জল। ফটিক পানি—স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল জল। আভাঙ্গা জল—প্রাতঃকালে উদ্ধৃত জল। ঘিয়ের ফুট—ঘৃতবিন্দু তুল্য উপকারী। কুত্—অধিক পরিমাণে উঠাইয়া বাসিত করিয়া রাখা।

এই সকল কথা নিতান্ত অসার মনে করা যায় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক কথারই সারবত্তা লক্ষিত হয়। কূপোদক ভিন্ন, নদী কি পুষ্করিণীর টাট্‌কা জল পান করায় তৃপ্তি নাই, প্রত্যুতঃ শরীরে বিঘ্ন আনয়ন করে। সুতরাং স্ত্রী-কবির "ঘাটে খায়" উক্তি অসার হইতে পারে না। জল বাসী হইলে তাহার মলভাগ অনেকাংশে নিম্নে পতিত হয়। সুতরাং উপরের জল ফুরাইলে কলসের তলস্থ জল মলিন জানিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। সেই কারণেই স্ত্রী-কবি "শেষানি" জল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। বস্তন্তর মিশিলে জল পচিয়া যায়। অতএব, "মিশানি" জল পান করাও স্ত্রী-কবির মতে নিষিদ্ধ। জলের নিজের কোন রস নাই, অন্য বস্তুর সংসর্গেই জলের রসানুভব হইয়া থাকে। অন্যান্য রস অপেক্ষা কষায় রস প্রাপ্ত জল অধিক দূষণীয়। পিত্তল প্রভৃতি ধাতু পাত্রে অধিককাল থাকিলে জল কষায় রস প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-কবি যে "কষানি" জলপান করিতে নিষেধ করিতেছেন, বুঝিতে হইবে যে, তাহা উক্ত প্রকারের, অর্থাৎ পিত্তলাদি পাত্রে বাসিত হওয়া প্রযুক্ত জল কষায়রস প্রাপ্ত হইলে তাহা পান কার্য্যে অতীব নিষিদ্ধ। বৃষ্টির জল সর্ব্বাপেক্ষা গুণকর। ইহা চিকিৎসকেরাও বলিয়া থাকেন। সেই জন্যই স্ত্রী-কবি "চাতক জল" পান করিবার উপদেশ করিয়াছেন। অভাবে স্ফটিক তুল্য নির্ম্মল জল পান করা বিধেয়। কীট প্রভৃতি দূষ্য বস্তু পড়িবার সম্ভাবনা বলিয়া কলসীর মুখ সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। রৌদ্র, জ্যোৎস্না ও শিশির সংযোগের পর প্রাতঃকালের জল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও নষ্টদোষ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই স্ত্রী-কবি পানের জন্য, "আভাঙা" জল তুলিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া বলিতে হয় যে, পানীয় জলের উত্তমতা গৃহিণীদিগের বিশেষ গুণপনার উপর নির্ভর করে।

আসন—বসিবার স্থান বা তৎসংক্রান্ত দ্রব্য। বাসন—দ্রব্যাদি রাখিবার পাত্র বা তৎসংক্রান্ত কার্য্য। বসন—বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, তাহার

পারিপাট্য করা। শায—শয্যা বা তাহার সুব্যবস্থা (সাজ হইলে—বেশভূষা) লালন—স্নেহপাত্রদিগের প্রতি প্রীতি ব্যবহার। পালন—রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই সকল কার্য্য স্ত্রী-জাতির অসাধারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল বিষয়ে যে গৃহিণীর নৈপুণ্য নাই, সে গৃহের গৃহস্থেরা ও আগন্তুকেরা সর্ব্বদাই অসুখী।

রাখা—গৃহস্থলীয় দ্রব্যের সংরক্ষণ। ঢাকা—গৃহস্থলীয় দ্রব্য যাহাতে ভাল থাকে তাহা করা। শিল্পিকর্ম্মা—গৃহস্থলীয় দ্রব্যের প্রস্তুত করণাদি বিবিধ প্রকার কার্য্য। রামশর্ম্মা নামক কোন ব্যক্তি এই সকল কার্য্য স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যনিচয়কে আমরা গার্হস্থ-শিল্প বলিয়াছি। উক্ত কার্য্যসকল বিলক্ষণ নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতে হয়, সুতরাং শিল্প নামে গণনা করা অন্যায় নহে। শিশুপালন কার্য্যটী স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ আবশ্যক এবং উহা শিক্ষা ও অভ্যাস না করিলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম ও রোগ প্রতিকারের উপায় বা চিকিৎসা-শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে পালন কার্য্যটী উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করা যায় না। ভাবিয়া দেখ, শিশু-পালন কার্য্যের সহিত চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিলক্ষণ যোগ দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বকালের রীতি ছিল যে, বালক বালিকার পীড়া হইলে প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরাই প্রায় "আমুই" (সামান্য ঔষধ) দিয়া আরোগ্য করিতেন; ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইত না। বালক অবস্থায় প্রায় সকল প্রকার পীড়ার শান্তিকারক দ্রব্য তাঁহারা সঞ্চিত রাখিতেন। এখন আমরা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতেছি যে বালক চিকিৎসা সম্বন্ধে পূর্ব্ব কালের প্রাচীনা গৃহিণীরা যেরূপ অভিজ্ঞা ছিলেন, এক্ষণকার ডাক্তারেরা তাহার শতাংশের একাংশও নহেন। হায়! তাঁহারা মূর্খ—আর আমরা পণ্ডিত !!—

ক্রমশঃ।

নারী-চরিত।

চাঁদবিবি।

এই প্রস্তাবের শীর্ষস্থানীয়া মহিলা একটী মুসলমান বীর রমণী। বীর-প্রসূতি ভারতগর্ভে ইঁহার জন্ম এবং ভারত রঙ্গ-ভূমিতেই ইঁহার বীরত্বের অভিনয় হইয়াছিল। ভারতেতিহাস আলেখ্যে চাঁদ বিবির প্রতিমূর্ত্তি অক্ষয় বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—প্রায় শতাব্দীত্রয় অতীত হইল, চাঁদ সুলতানার দেহের পরামাণু পৃথিবীর ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, কিন্তু মরিয়াও তিনি লোকের স্মৃতিপথে জীবিতের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।

মোগল সম্রাট আকবর সাহ সিংহাসন আরোহণ করিয়াই আপন রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। আহম্মদ নগর ও বিজয়পুর এই দুইটী রাজ্য সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। দুইটীই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, কেহ কাহার নিকট অধীনতা স্বীকার, কিম্বা সন্ধি সংস্থাপন দ্বারা বন্ধুতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে না। এই নিমিত্তই এই দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ ক্রমাগত চলিতেছিল। কোন যুদ্ধে বিজয়পুরাধিপতি, কোন যুদ্ধে বা আহম্মদনগরপতি জয়ী হইতেন। এইরূপ অবিশ্রান্ত যুদ্ধে উভয় রাজ্যই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, উভয় রাজ্যই ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বাদসাহ আকবর এই দুইটী রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলেন যে দাক্ষিণাত্য জয়ের সুসময় এই।

আহম্মদনগরের চতুর্থ রাজা মুরটেজা নিজাম সার বুরহান সা নামক এক ভ্রাতা ছিল। ১৫৮৬ খৃঃঅঃ বুরহান আহম্মদনগরের সিংহাসন এই বলিয়া দাবী করিলেন যে তাঁহার ভ্রাতার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, সুতরাং তিনি রাজ্য শাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বুরহানের এরূপ শক্তি ছিল না যে সে তাহার ভ্রাতার রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করে। রাজ্য-লোলুপ বুরহান স্বদেশের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যলাভ আশায় সম্রাট আকবরের শরণাপন্ন হইল এবং আপন মাতৃভূমির বিনাশ সাধনের জন্য আকবর সাহকে

অনুধাবন করিতে উত্তেজিত করিল। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সে আকবর সাহের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিল। অবশেষে ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে বুরহানের ভ্রাতা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,—বুরহানের আশা পূর্ণ হইল, তিনি নির্ব্বিবাদে আহম্মদনগরের সিংহাসন আরোহন করিলেন। বিজয়পুর ও আহম্মদনগর এই দুই রাজ্যের মধ্যে বৈরীভাবের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন দ্বারা এই অসদ্ভাব দূর করিবার আশায় আহম্মদ নগরের এক রাজপুত্রীর সহিত বিজয়পুরের এক রাজপুত্রের পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইল। এই রাজপুত্রীই আমাদিগের চাঁদবিবি। চাঁদবিবি বুরহানের ভগিনী। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকগণ চাঁদবিবির বীরত্বের ও জীবনের অদ্ভুত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া কয়েক ছত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন্ সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল কিরূপে অতিবাহিত করেন এ সকল বিষয় কিছুই বর্ণন করেন নাই। এমন কি প্রধান প্রধান ইতিহাসবেত্তাগণও তাঁহার পিতার নামও উল্লেখ করেন নাই। যৎকালে বুরহান সা রাজভার গ্রহণ করেন, সেই সময়ে রাজ্য অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন ছিল। আহম্মদনগরবাসীদিগের মধ্যে একতা ছিল না। রাজ্যের লোকের মধ্যে একতার অভাব হইলে দেশ যেরূপ দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, আহম্মদনগরেরও সেই দশা হইয়াছিল। যদিও বিজয়পুর ও আহম্মদ নগরের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিবার জন্যই চাঁদবিবির বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটী রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল না। অল্প সময়ের মধ্যেই বুরহানের মৃত্যু হইল। বুরহানের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বাহাদুর নিজাম সা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, চাঁদবিবি ইহার রক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আহম্মদনগরবাসীগণ চারিটী দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাদিগের মধ্যে এক দল মোগল সম্রাট আকবরকে আহম্মদনগর আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। আকবর সাহ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন যে আহম্মদনগর রাজ্য আক্রমণ করিবেন। আহম্মদনগরের এই অসহায় অবস্থায় এক মাত্র চাঁদবিবি সহায় হইলেন। তিনি বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া আপন মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

এদিকে আকবর সাহ তাঁহার পুত্র মুরাদ ও মিরজা খাঁ নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষকে আহম্মদনগর আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

মোগল সেনা তাঁহাদিগের বিজয়পতাকা উড়াইয়া আহম্মদনগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কাহার সাধ্য যে দিগ্বিজয়ী মোগল সৈন্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, আহম্মদনগরের গৌরব রক্ষা করে! মোগলের পদভরে আহম্মদনগরের বক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল! আর রক্ষা নাই। আবার এদিকে আহম্মদনগরের আসন্ন বিপদ দেখিয়া তথাকার একজন প্রধান সেনাপতি পলায়ন করিল। ভীরু কাপুরুষ! এই জন্যই কি তোমার হস্তে এই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল! সেনাপতির নামের কলঙ্ক, তুমি, কাহার হস্তে আহম্মদনগর অর্পণ করিয়া পলায়ন করিলে! শত্রুগণ আসিয়া দুরন্ত ব্যাধের ন্যায় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, আর তুমি দেশের প্রতি স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়া ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক মাতৃ-ভূমিকে শত্রু পদতলে নিক্ষেপ করিয়া গেলে!! অবিশ্বাসী তোমাকে ধিক্। আহম্মদনগরবাসী ভয়ে আকুল, ভবিষ্যতের চিন্তায় প্রায় জ্ঞানশূন্য, "কি হইবে" দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত লোকের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই কথা নিঃসৃত হইতে লাগিল! নিরাশা, ভয়, দুঃখে সকলে বিহ্বল। আর এদিকে চাঁদবিবি দেশোদ্ধাররূপ মহামন্ত্র সাধন করিতেছিলেন। আহম্মদ-নগরের এরূপ শক্তি ছিল না যে অন্য রাজ্যের সহায়তা ব্যতীত রক্ষিত হইতে পারে, সুতরাং দেশীয় অন্যান্য রাজার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে নিযুক্ত হইলেন। বিজয়পুরাধিপতি ও অন্যান্য রাজার নিকট চাঁদবিবি আহম্মদনগরের রাজার দুঃখবার্ত্তা গোচর করিলেন, কেহ কেহ আসিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিজয়-পুরের রাজা চাঁদবিবির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। চাঁদবিবি প্রতিজ্ঞা করিলেন—হয় আহম্মদনগর রাজ্য শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন নতুবা রণক্ষেত্রশায়িনী হইবেন। তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া সৈন্যদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। নিস্তেজ নিরুৎসাহ সৈন্যগণ চাঁদবিবির উৎসাহজনক বাক্যে নূতন উৎসাহ ও সাহস প্রাপ্ত হইল। "হয় মরিব না হয় মারিব" এই কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এইরূপে চাঁদবিবির উৎসাহ, দেশহিতৈষিতা

ও বীরত্ব দেখিয়া নির্জীব আহম্মদনগরবাসীগণ নব-জীবন প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চাঁদবিবি স্বহস্তে তরবারি লইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি তিনি দুর্গ-সংস্কারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

চাঁদবিবির এতদূর উৎসাহ ও যুদ্ধের এতাদৃশ আয়োজন দেখিয়া সম্রাট-কুমার মুরাদেরও উৎসাহ ও সাহস দ্বিগুণিত হইল। অতিশয় পরাক্রমের সহিত মোগলসৈন্য আহম্মদনগর আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রবল পরাক্রমের সম্মুখে আহম্মদনগর সেনানীগণ অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না। মোগলগণ "আকবর সাহের জয়" বলিয়া দুর্গ প্রবলবেগে আক্রমণ করিল; দুর্গের প্রথম দ্বার মোগলপরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না। মোগল-সিংহের পদাঘাতে সেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। মোগলসেনা অনায়াসে সেই দ্বার অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় দ্বারের নিকট উপনীত হইল। পুনরায় "জয় আকবর সিংহের জয়" ধ্বনিতে দ্বিতীয় দ্বার কম্পিত হইল, অচিরে সে দ্বারও ভগ্ন হইল; এবং অনতিকালের মধ্যেই দুর্গের তৃতীয় দ্বার আক্রমণ করিল, এবং মোগলসিংহের পদাঘাতে প্রাচীরও এক স্থানে ভগ্ন হইয়া গেল। আহম্মদনগরবাসীরা এই ভয়ানক বিপদে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নের উদ্যোগ দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে চাঁদবিবি যোদ্ধৃ-বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বীরত্ব ও উৎসাহ বাক্যে আহম্মদনগর-সৈন্যদিগের হৃদয়ে উৎসাহানল পুনরায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। চাঁদবিবি উলঙ্গ তরবারি হস্তে বীরমদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার হয়, কাহার না দুর্ব্বল হস্ত দ্বিগুণিত রূপে বলশালী হইয়া উঠে, কাহার না ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে? কে না দুর্দশা-গ্রস্ত শত্রুপ্রপীড়িত মাতৃভূমির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়!!!

আহম্মদনগরবাসীগণ উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া "হয় মরিব না হয় মারিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, এবং বর্দ্ধিত পরাক্রমের সহিত মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। অসংখ্য কামানের গোলা ও তীর মোগলদিগের প্রতি বর্ষিত হইতে লাগিল। ভগ্নস্থানে কতকগুলি কামান সংস্থাপিত হইল;

সম্মুখস্থ সৈন্যগণ অত্যন্ত সাহসের সহিত মোগলদিগের গতিরোধ করিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম চলিল, অবশেষে মোগলসৈন্যগণ আহম্মদনগর-সৈন্যের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাদ্‌গামী হইতে লাগিল। সেই দিবস যুদ্ধ ক্ষান্ত রহিল। চাঁদবিবি অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার উৎসাহ, দৃঢ়তা ও কার্য্যদক্ষতা কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হইল না। মোগল সৈন্যগণ প্রভাতে উঠিয়া দেখিল যে ভগ্নস্থল সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইয়াছে এবং আর প্রবেশের উপায় নাই। যদিও সেই সময়ে মোগলসৈন্যগণ বলশালী ও পরাক্রান্ত ছিল, কিন্তু পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইল না। চাঁদবিবিরও তাঁহার সৈন্যদিগের প্রতি বিশ্বাস ছিল না; সুতরাং তিনিও রণে ক্ষান্ত হইলেন, এবং সন্ধি সংস্থাপিত হইল। ১৫৯৬ খৃঃ অঃ এই সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা বেরারের অধিকার সম্রাট আকবরকে প্রদত্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

কেন এমন হইল?

নিত্যানন্দ বাবু সেকেলে গোচের লোক, বাবুগিরির (তাঁহার মতে পরিষ্কার কাপড় পরাই বাবুগিরি) উপর বড় চটা। বাটীর কোন ছেলেকে ভাল কাপড় পরিতে দেখিলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠেন "আ! ছেলেগুলা একেবারে গেল!" কাহার মুখে হাসি ভাল বাসেন না, বলেন তাহাতে মন চঞ্চল হয়, গাম্ভীর্য্য থাকে না। বাড়ীতে কোন রকম গল্পের পুস্তক আনা একেবারে নিষিদ্ধ—সংবাদপত্র ভাল নয় বলিয়া পড়িতে বারণ। ছেলেমেয়ে দুদণ্ড আমোদ আহ্লাদ করিবে, হাসিবে, চীৎকার করিবে, তাহাতেও আপত্তি। সকলকে ধর্ম্মপথে আনিতে হইবে, গম্ভীর শান্তপ্রকৃতি যাহাতে হয়, তদ্বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে, এই আশা করিয়া তিনি বাটীর কোন শিশুকে চক্ষের অন্তরাল করেন না। শিশু-সুলভ স্ফূর্ত্তিতে কেহ তাঁহার নিকট আসিতে পায় না। হাসিলে বাবা বকিবেন, দৌড়াদৌড়ি করিলে শাস্তি পাইব, এই ভয়ে সবাই সশঙ্কিত! একদিন

সুরমা সুশীলার উপাখ্যান পড়িতেছে এমন সময় পিতা আসিয়া উপস্থিত; কি পড়িতেছ বলিয়া দেখেন কি না "উপাখ্যান"। আর রক্ষা নাই, তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং কঠোর স্বরে বলিলেন "তোর মত দুষ্ট মেয়ে আর দেখিব না, এত বড় আস্পর্দ্ধা! তোমাদের হাতে যদি আবার এমন সব পুস্তক দেখি বিলক্ষণ শাস্তি দিব।" সুরমা অবনত বদনে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল "বাবা, ঐ বৈ খানি দাদা দিয়াছিলেন, উহাতে খুব একটী ভাল মেয়ের কথা আছে।" তাহার সে কথা কেবা শুনে; পিতা বরং অধিকতর রাগে বলিলেন "ভাল মন্দ আমি জানি না, আমার কথা শুনিতে হইবে। পড়িতে হয়ত দময়ন্তী, সীতার কথা পড়, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের কথা আছে সেই বৈ দেখ।" যে প্রকার বিরক্ত ও রুক্ষভাবে পিতার মুখ হইতে এই কথা গুলি উচ্চারিত হইল, তাহাতে সন্তানের শিক্ষা হওয়া দূরে যাউক, তাহার মনে কেবল মন্দ ভাবেরই উত্তেজনা করিয়া দেওয়া হইল, কারণ পিতার ব্যবহারে তাহার মনে রাগ ও ভয় যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হইল—সে কিছু বুঝিল না। দুঃখে, অভিমানে চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন সময় জ্যেষ্ঠ সহোদর নিকটে আসাতে বলিল "দাদা! বাবা সবতাতেই আমাদের বকেন। আজ কোন অন্যায় কাজ করি নাই, তবুও বকুনি খাইলাম—সবাই বলে সুশীলার উপাখ্যান ভাল, কিন্তু বাবা তাহা বলিতেও দিলেন না। তাঁর এত রাগ কেন হয়? হাসিলেও বাবা রাগ করেন, দৌড়াইলে বলেন চুপ্ করে বসো, ভাল কাপড় পরিতে দেখিলে বলেন তোদের ছেলেবেলা হইতে আসক্তি! বৈরাগ্য শিখ্‌তে হয় ত এ সব ছেড়ে দে। সত্যি দাদা আমি ত এ সব বুঝিতে পারি না। বৈরাগ্য আসক্তি কাকে বলে তুমি জান? বাবার কাছেত সর্ব্বদাই ঐ কথা শুনিতে পাই, কাপড় ও গহনা পরিলেই তিনি ঐ কথা বলেন। দাদা ছেঁড়া, ময়লা কাপড় পরা কি বৈরাগ্য, আর ভাল কাপড় ও গহনা পরার নাম কি আসক্তি!

এক দিন ছোট নিরু স্কুল হইতে আসিয়া দৌড়ে মার কোলে উঠিল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল মা আজ আমি সব ছেলের উপর ছিলাম।

মাতা আদরে মুখ চুম্বন করাতে বালকের সহাস্য মুখ আরও প্রফুল্ল হইল। সে বলিতে লাগিল "মা আমি রোজ রোজ এমনি করে পড়া করিব, তাহা হইলে তুমি আমাকে খুব ভাল বাসিবে?" এমন সময় পিতাকে আসিতে দেখিয়া সে অন্য দ্বার দিয়া চলিয়া গেল। বাবাকে দেখিলে কাছে আসা দূরে যাক্, কে কোথায় পালাইবে ঠিক্ পায় না, এমন কি তিনি আদর করিতে গেলেও তাহারা ভাবে বুঝে বকিবেন।

নিত্যানন্দ বাবুর রাগের ভয়ে সব ছেলে কম্পিত! বাহিরে যে যাহা করুক, তাহার সম্মুখে সবাই নিরীহ ভালমানুষ—তিনিও এই সব দেখিয়া ভাবেন তাঁহার স্বীয় সন্তান পালনের রীতি উৎকৃষ্ট। মনে মনে এই ভাবিয়া বড়ই আশান্বিত যে তাঁহার সন্তানেরা ভবিষ্যতে খুব ভাল হইবে, শাসনে থাকিয়া বাধ্য হইতে শিখিবে। ধর্ম্মের কথা শুনিয়া ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। কারণ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক ছাড়া তিনি কখন কাহাকেও আর কোন পুস্তক পড়িতে দেন না। দশ ছেলে মিলিয়া যেখানে আমোদ করে, তাঁহার সন্তানেরা সেখানে যাইতে পায় না। নির্দ্দোষ শিশুর সহাস্য মুখ গভীর কথার অর্থ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া যখন বিমর্ষভাব ধারণ করে, পরলোক, বৈরাগ্য, আসক্তি, পিতৃমুখবিনির্গত বড় বড় বাঁধাগত শুনিয়া তাহারা যখন স্তম্ভিতের ন্যায় চাহিয়া থাকে; আহ্লাদে দৌড়িতেছে, খেলা করিতেছে, পিতাকে দেখিবা মাত্র দোষীর ন্যায় থমকিয়া দাঁড়ায়; পারতপক্ষে পিতৃসমক্ষে আসে না, তখন পিতা মনে করেন আমার শিক্ষার ফল আশাজনক, কারণ আমি কিছু বলিলেই সকলে চুপ্ করিয়া থাকে, আমার কাছে সবাই শান্ত ও ধীর।

(ক্রমশঃ)

সৌন্দর্য্য। *

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই অপর সাধারণ সকলেই সৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতী; যাহা কিছু সুন্দর সকলে তাহাই ভালবাসে, সেই দিকেই

* বঙ্গমহিলা সমাজের অন্যতম সভ্য কর্তৃক রচিত এই প্রস্তাব উক্ত সভায় পঠিত হয়।

সাধারণতঃ সকলের মন আকৃষ্ট হয়; সুন্দর বস্তু দেখিয়া মোহিত না হয়, এরূপ লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, আমরা সকলেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া থাকি।

আমাদের মধ্যেও দেখিতে পাই যে আমরা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই কিরূপে শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে, তাহা লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে শারীরিক সৌন্দর্য্য অনেক সময় এই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে বটে, সামান্য মানবের চক্ষু অনেক সময় বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া যায় বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এ জগতের সমুদয় পদার্থই বিনশ্বর, দেখিতে দেখিতে কালের ঢেউতে সমস্ত পদার্থই মিশিয়া যাইতেছে ও যাইবে; আজ আমরা যে দ্রব্য দর্শনে একবারে মোহিত হইয়াছি, দুদিন পরে তাহা অনন্ত কালের গর্ভে চিরকালের মত লুক্কায়িত হইবে, সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন। যতকাল সে সৌন্দর্য্য এ পৃথিবীতে থাকে; ততকাল এ সংসারে তাহার স্বর্গীয় শক্তি বিস্তার করিয়া এই পৃথিবীবাসী সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে; কিছুকাল পরে যখন সেই আত্মা এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখনও তাহার কার্য্যকলাপ তাহাকে এই পৃথিবীতে সজীব রাখে, শ্মশানভূমি সেই সৌন্দর্য্যের শেষ স্থান নহে; শারীরিক সৌন্দর্য্যের ন্যায় তাহা পৃথিবীর ধূলায় মিশিয়া যায় না, প্রত্যুত সেই সৌন্দর্য্য শ্মশানভূমি ভেদ করিয়া স্বীয় অলৌকিক প্রভাবে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে। লোকে সেই সৌন্দর্য্য সহজে বিস্মৃত হয় না। সে পবিত্র সৌন্দর্য্য কোন কালে অপনীত হইবার নহে। সংসার তাহাকে চিনিতে না পারুক, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সে নিঃশব্দে আপন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

এখন আমরা দুটী বিভিন্ন প্রকার চিত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করি, তাহাহইলেই ইহাদের মধ্যে যে তারতম্য আছে তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে। ঐ যে বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত রমণীকে দেখিতেছ আর দুদিন পরে হায়! ইহার এ সৌন্দর্য্য রাশি কোথায় চলিয়া যাইবে? অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমরা উহার অবশিষ্ট কিছুই দেখিতে

পাইব না। রমণীর সংসারে যে সকল গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তৎপ্রতি তাহার একটুও দৃষ্টি নাই; সামান্য শারীরিক সৌন্দর্য্য লইয়াই ব্যস্ত, আত্মার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির দিকে একটুও যত্ন নাই। তৎকর্ত্তৃক এমন একটি সামান্য কার্য্যও সাধিত হয় নাই, যাহা সমাজের কোন বিশেষ উপকারে আসিতে পারে। তিনি যাহা লইয়া ব্যস্ত, সেই সকল বসন ভূষণ—সকলই পড়িয়া থাকিবে; ইহাদ্বারা তাঁহার আর কণামাত্রও উপকার হইবে না। অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অন্য একটী রমণী দেখিতে পাইব—তিনিও স্বীয় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে একান্ত উৎসুক, কিন্তু এ সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন প্রকারের। তাঁহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের দিকে দৃক্‌পাতও নাই; তাঁহার সমুদয় যত্ন হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির দিকে। তিনি পবিত্রতার বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত হইয়া আপন আত্মার সৌন্দর্য্য দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়া নিজে বিপুল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। কত দিন পরে মৃত্যু আসিয়া ইহাঁকেও এ সংসার হইতে লইয়া যাইবে, তখন তাঁহার বাহ্যিক যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ছিল, সকলই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার আত্মার সৌন্দর্য্য অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে; ইহার উপর মৃত্যুর হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। জগৎ এ সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইতে পারে না; ইহা অমর।

এখন দেখা যাউক কি কি উপায়ে আমরা হৃদয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারি। হৃদয়কে উন্নত করিবার প্রধান উপায় শিক্ষা; কিন্তু কিরূপ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক তাহা বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। কেবল কি কতকগুলি পুস্তক পাঠ শেষ করিতে পারিলেই প্রকৃত শিক্ষা হইল? সামান্য লিখন পঠন ও ভাষাজ্ঞানের নাম প্রকৃত শিক্ষা নয়। প্রকৃত পক্ষে যাহা আমাদিগকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সৎসাহসী, ও স্বদেশ-বৎসল হইতে শিক্ষা দেয়, যাহা আমাদিগকে সমুদয় কষ্ট বিপদের মধ্যে অটল থাকিতে সক্ষম করে, যাহা আমাদের মানসিক সদ্‌গুণ-নিচয়কে প্রস্ফুটিত করে, যে শিক্ষা আমাদিগকে মনুষ্য নাম ধারণের উপযুক্ত করিয়া দেয়, সেই শিক্ষার নামই প্রকৃত শিক্ষা। পুস্তক পাঠ আত্মোন্নতি সাধনের প্রধান উপায়; পুস্তক পাঠ দ্বারা আমাদের চিন্তাশক্তি

বৃদ্ধি পায়; কোন একটি ভাল বিষয় পাঠ করিয়া তাহা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে সেই বিষয় আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করে, মনের সেই আগ্রহ শান্তি করিবার জন্য আরও অধিক পুস্তক পাঠ করিতে হয়, এইরূপে দিন দিন আমাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমাদের হৃদয়ের সদ্‌গুণসমূহের প্রকৃতরূপ উন্নতি হয়, সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক, কারণ হৃদয় উন্নত না হইলে জ্ঞানলাভ করিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। আমাদের হৃদয়ে দয়া প্রভৃতি যে সকল সুকোমল বৃত্তি আছে, তাহাদের যাহাতে সমুচিত বিকাশ হয়, সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক সমাজেই রোগ শোকগ্রস্ত ব্যক্তি আছেন, এই সকল দুঃখীদের দুঃখ দেখিলে কাহার না হৃদয় ব্যথিত হয়? পরদুঃখকাতরা কুমারী নাইটিংগেলের জীবন পাঠ করিয়া দেখিলে একবারে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়।

কুমারী নাইটিংগেল পিতার যত্নে সুশিক্ষিতা হইয়া মনে মনে জনসাধারণের দুঃখ দর্শনে এই সংকল্প করেন, যে তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধি বৈভব যাহা কিছু আছে, সকলই দুঃখিত ও পীড়িতদিগের কল্যাণের জন্য সমর্পণ করিবেন। তিনি কেবলমাত্র দয়ার বশীভূত হইয়া আত্মীয় স্বজন, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধাহত সৈন্যদিগের সেবা করিবার জন্য অতি দূরদেশে গমন করেন। কুমারী নাইটিংগেল যে সকল কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, সকলের পক্ষে সেইরূপ কার্য্য করা সম্ভব নহে, তথাপি সকলেরই রোগ শোকগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দুঃখ উপশমের জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পরের দুঃখে যে হৃদয় কাঁদিতে পারে, সে হৃদয়ের ন্যায় সুন্দর পদার্থ এ জগতে কি আছে?

হৃদয়ের উৎকর্ষ সম্পাদনের যত প্রকার উপায় কল্পনা করা যাইতে পারে, ধর্ম্মই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ধর্ম্ম-বিষয়ে অতি পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যে আমাদের কতদূর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সামান্য ভূষণ ত্যাগ করিয়া যাহাতে আমরা ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভূষণে আমাদের হৃদয়কে ভূষিত করিতে পারি, সেইদিকে আমাদের যত্ন থাকা একান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরপ্রেমে নিমগ্ন, পরদুঃখকাতরা, উন্নত-

হৃদয়া রমণীর হৃদয়ের অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সহিত এ পৃথিবীর কোন পদার্থের তুলনা হইতে পারে না।

ভ্রমণকারীর পত্র।

বম্বে।

বম্বের অনেক স্থান কাল দেখিয়াছি, কিন্তু বাহিরের দেখা মাত্র। সর্ব্বপ্রথমে জেনেরাল পোষ্ট আফিষ দেখিতে যাই। পাঠিকা ভগিনি! কলিকাতার লালদীঘির ধারে বড় ডাকঘর বোধ হয়, দেখিয়াছ;—এখানকার বড় ডাকঘর তদপেক্ষা ছোট। দ্বিতল বাড়ী, কিন্তু উপরে খোলার চাল। এখানকার কি ছোট, কি বড় যত বাড়ী আছে,—সামান্য একতলা কি দুতলা বাড়ী হইতে বড় বড় সুবিস্তৃত আকাশভেদী পাঁচতলা, ছতলা বাড়ী পর্য্যন্ত সকলই খোলার চালে ঢাকা। ডাক ঘরের মেজে মারবেল পাথরে গাঁথা, তাহার উপর কাজ করা। এদেশে পাথরের অভাব নাই। আলাহাবাদের নিকটস্থ চারনি ষ্টেশনের নিকট বড় বড় পাথরের খনি আছে। আলাহাবাদ আসিবার সময় তাহা দেখা যায়; সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া বম্বের নিকট পর্য্যন্ত যত পাহাড় আছে,—ইহাদের সংখ্যাও কম নয়,—সকল পাহাড়েই খুব বড় বড় পাথর পাওয়া যায়। আমি আসিবার সময় ৪।৫টা পাথরের টানেলের ভিতর দিয়া আসিয়াছি। টানেল কাহাকে বলে জান কি? খুব উচ্চ উচ্চ প্রস্তরময় পর্ব্বতের ভিতর দিয়া যে সুরঙ্গ করা হয়, যাহা পোলের মত বোধ হয়, যেখানে পাহাড়ের ভিতর দিয়া গাড়ী বা লোক যাতায়াতের পথ থাকে, তাহাকেই ইংরাজীতে টানেল (Tunnel) বলে। মুঙ্গের, জামালপুর, প্রভৃতি স্থানে কি কখনও আসিয়াছ? তাহাহইলে জামালপুরের নিকট টানেল দেখিয়া থাকিবে। এই সকল পাহাড়ের পাথর বোম্বাইয়ে অতি সহজেই সংগ্রহ করিতে পারা যায়। জব্বলপুরের নাম শুনিয়াছ, রাত্রি ৭৷৷৹ টার গাড়ীতে আলাহাবাদ ছাড়িলে, ৫৷৷৹টার সময় জব্বলপুর আসা যায়। জব্বলপুরের নিকটে অনেক মার্বেল বা শ্বেত পাথরের খনি আছে।

ডাকঘর হইতে টেলিগ্রাফ আফিষে যাই। এখানকার টেলিগ্রাফ আফিষ আমাদের টেলিগ্রাফ আফিষ হইতে অনেক ছোট। কলিকাতার লালদীঘির দক্ষিণপারের সেই প্রকাণ্ড লাল সুসজ্জিত বাড়ীর মত সুন্দর বাড়ী কলিকাতাতেই দুইটী খুজিয়া পাওয়া কঠিন,—বোম্বাইয়েরত কথাই নাই!

টেলিগ্রাফ আফিষ হইতে এখানকার বড়বাজারের ভিতর দিয়া অনেকক্ষণ বেড়াই। কলিকাতার বড়বাজারের মত এখানেও একটী বড় বাজার আছে, এবং তাহাকে বড়বাজারই বলে। বড়বাজারের বাড়ীগুলি প্রায় ৪। ৫ তলা, মাঝে মাঝে ছতলা, এমন কি সাততলা বাড়ীও দেখিতে পাওয়া যায়;—কিন্তু সকলেরই খোলার চাল। বড়বাজারের ভিতর দিয়া কতক্ষণ গিয়াছি, এমন সময় নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। সুমুখে একটু দূরে চাহিয়া দেখি বড় বড় ধামার মত জরিদার পাগড়ী মাথায় এবং শুঁড়ওয়ালা লাল লাল জুতা পায়ে একদল লোক একটা চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া গোল করিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে লাল, কাল, বেগুণে, হলদে, প্রভৃতি অসংখ্য বর্ণের সামান্য শাটী হইতে বহুমূল্য বোম্বাই জরিদার শাটী পরিহিতা অতি সুন্দর ও সুশ্রী একদল যুবতী ও প্রৌঢ়া তাঁহাদের ভাষায় গান করিতে করিতে চলিয়াছেন; তাঁহাদের আর কোন অলঙ্কার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারিলাম না,—কিন্তু যাহা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের পায়ে মানকচুর মত মোটা মোটা মল। আমার বোধ হয় বাঙ্গালী মেয়েদের ত কথাই নাই, অনেক বাঙ্গালী পুরুষই এই রূপার শিকলি পায় দিয়া দুপা চলিতে পারেন না। ইহাদের পায়ে এত বড় বড় "খাড়ু" আমার ভাল লাগিল না। যদি এইরূপ "খাড়ু" কাহারও প্রয়োজন হয়, তবে বাঙ্গালি মেয়েদেরই পরা উচিত। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে প্রকাশ্য রাস্তায় বেড়াইতে পারেন, যাঁহাদের শতলোকের ভিতর দিয়া অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া যাইবার শক্তি ও অধিকার আছে, তাঁহাদের পায় এত বড় বেড়ী খাটে না।

বম্বেতে স্ত্রী-স্বাধীনতা বাঙ্গালা অপেক্ষা শতগুণে অধিক। এখানে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের মত ভিক্টোরিয়া গার্ডেন নামে একটী সুন্দর

বাগান আছে। ইহার ভিত্তি ১৮৬২ সনের নবেম্বর মাসে, বম্বের তদানীন্তন গবর্ণর স্যার বার্‌টল ফ্রিয়ার কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। কিন্তু টাকার অভাব হওয়াতে ১৮৬৫ সনে গবর্ণমেণ্ট পুনরায় ইহার কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার সন্নিকটে একটী মিউজিয়ম বা যাদুঘর আছে; এইটী সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী ১৮৭১ সনে খোলা হয়। ভিক্‌টোরিয়া গার্ডেনে শুনিয়াছি সন্ধ্যার সময় শত শত পারসী ও মহারাষ্ট্রীয় ভদ্র-মহিলা দলে দলে বেড়াইতে যান। বম্বের স্ত্রীলোকেরা যে তোমাদের মত অন্তঃপুর কারাগারে বদ্ধ থাকেন না, ইহাহইতেই তাহার প্রমাণ পাইবে। সম্প্রতি এখানকার গবর্ণর একটী নিয়ম করিয়াছেন। গবর্ণর মাঝে মাঝে দেশীয় এবং বিদেশীয় বড় বড় লোকদিগকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান গবর্ণর এই নিয়ম করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট হাউসের "বলে" বা নৃত্যে যে সকল ভদ্রলোক সস্ত্রীক যাইবেন, তাঁহাদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। এই নিয়মটী আমার বড় ভাল লাগিল। বাস্তবিক যে সকল দেশীয় পুরুষ আপনাদিগের পত্নীগণকে প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক নন, বিদেশীয় ভদ্র-মহিলাগণের সমাজে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার থাকা উচিত নয়।—রা—মহাশয়ের পত্নী অনেক দিন গবর্ণমেণ্ট হাউসে 'বল' প্রভৃতিতে গিয়াছেন। এটী বড় সুখের খবর নয় কি? বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গালীর গৃহিণী, কবে সকলে এইরূপ ভদ্রভাবে প্রকাশ্য সভায় ও আমোদের স্থানাদিতে যাইতে অগ্রসর হইবেন?

মহারাষ্ট্রী স্ত্রীলোকদিগের প্রসঙ্গে নানা কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। প্রথমে যে বিষয় লইয়া তাহার আরম্ভ করি, এতক্ষণে বোধ হয়, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছ। বড়বাজারের রাস্তায় যে (Procession) দেখিয়াছিলাম, তাহার আরও অনেক কথা বলিবার আছে। সর্ব্বপশ্চাতে স্ত্রীলোকেরা, তাঁহাদের সম্মুখে পুরুষেরা, এবং সম্মুখে দুটী ছোট বালক বালিকা স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে যাইতেছে। তাঁহাদের সম্মুখে ইংরাজী ব্যাণ্ড, এবং দেশীয় বাজনা। প্রথমে এই দৃশ্যটী দেখিয়া মনে করিলাম এটী হয়ত বিবাহ-যাত্রির দল। একটী পারসী ভদ্রলোক রাস্তায় যাইতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনিও বলিলেন বিবাহ।

কিন্তু যাত্রীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, এটী বিবাহ নহে, নিকটস্থ বাড়ী হইতে এই দুটী বালক বালিকা দেবালয়ে দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে যাইতেছে। আমি অনেকক্ষণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। (ক্রমশঃ)

আরাঞ্জীবের স্বপ্নদর্শন।

১৬৫৮ অব্দে শিপ্রা-তটে মোগলদিগের সহিত রাজপুতগণের একটী ঘোরতর সংগ্রাম হয়। ইতিহাসে ইহা উজ্জয়িনীর যুদ্ধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ইহার এক পক্ষে রাজপুত-কুল-তিলক যশোবন্ত সিংহ এবং অপর পক্ষে আরাঞ্জীব ও তদীয় ভ্রাতা মোরাদ। এই যুদ্ধে রাজপুতগণ মুসলমানের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন। যুদ্ধের পূর্ব্ব-নিশায় আরাঞ্জীব যে একটী অপূর্ব্ব স্বপ্নদর্শন করেন, নিম্নলিখিত কবিতাটী তদবলম্বনে রচিত হইল।

দেখ চেয়ে, ধীরে ধীরে মৃদু কল স্বনে,
বহিছে তরঙ্গবতী অবন্তী-বাহিনী
শিপ্রা—প্রসন্ন-বদনা—সাগর উদ্দেশে;
পতির সম্ভাষে যথা প্রণয়-শালিনী
সাধ্বী। বিমল সুনীল নিশার গগনে,
ভাসিছে চন্দ্রমা স্নিগ্ধ-নিরমল-জ্যোতি;
ফুটেছে কৌমুদীরাশি বসুমতীদেহে,
সুন্দরী বরাঙ্গে যথা ফোটেরে যৌবন;
ধরেছে ধবল শোভা সৈকত পুলিন
শান্তোজ্জল চন্দ্রকরে; প্রস্তর-শয্যায়
গাইতেছে মৃদু মৃদু ললিত রাগিনী,
শিপ্রা—অনন্ত-গামিনী—অনন্ত তরঙ্গে,
তাহাতে খেলিছে হাসি অনন্ত সুধাংশু,
জননী সকাশে সুখে খেলেরে যেমতি

শত ইন্দীবর-আভা নয়ন-নন্দন
শিশু। উপরে অনন্ত নভ—স্বচ্ছ নীল,
খচিত তারকা-ফুলে অনন্ত-সংখ্যক।
জ্যোৎস্না কৃপায় দৃষ্টি চলে যতদূর
তরঙ্গিণী উভয় পুলিনে, শুভ্র বর্ণ
শিবিরের শ্রেণী রয়েছে দাঁড়ায়ে সেই
নৈশ-নদী-তটে ; একপারে রাজপুত—
কুলের গৌরব যশোবন্ত বিরামিছে
অনীকিনী সনে ; অপর পুলিনে এক
শৈলের উপরি মোগল-শিবিরাবলী
রয়েছে নিদ্রিত ; সুগভীর বিভাবরী
সুষুপ্তি-সুস্থির ; রজনী পোহালে হবে
ঘোরতর রণ, কিন্তু এবে প্রকৃতির
আঁখি—নিমীলিত ঘুমে—জানি না কেমন
অয়ি গো নিসর্গ-রাণি ! তব লীলা খেলা।
এহেন নিশীথকালে মোগল শিবিরে
একটী প্রশস্ত কক্ষে এক বীরবর
নিদ্রা-নিমীলিত-নেত্র ; বিশাল ললাটে
তিনটী কুঞ্চিত রেখা ভাসিছে আঁধারে,
সহস্র চিন্তায় যেন হয়েছে অঙ্কিত ;
আয়ত উরস ; সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু ;
তেজ-গর্ব্ব-বিকশিত সর্ব্ব অবয়ব—
বীরের লক্ষণ ; নিদ্রাবেশে বীরোত্তম
দেখিল স্বপন এক অপূর্ব্ব সুন্দর।
আঁধারিয়া শত সূর্য্য দেহের প্রভায়
অতুল-মহিমা-জ্যোতি পুরুষরতন
দাঁড়াল শিয়রে আসি—ফুটিল শিবিরে
অপূর্ব্ব আলোক-ছটা—ত্রিদিব-সম্ভবা ;

বীর-ব্রতাচারী শান্ত-গম্ভীর-মূরতি,
এক হস্তে একখানি দীর্ঘ তরবারি
জ্বলিছে ধাঁধিয়া নেত্র—দিব্য তেজালোকে ;
সজল বারিদ স্বনে কহিল তখন—
"আরাঞ্জীব! তোর প্রতি বড় সুপ্রসন্না
আপনি মোগল-লক্ষ্মী—লক্ষ্মী কুলেন্দ্রাণী,
তাই পাঠালেন মোরে তোমার সকাশে
কহিতে আদেশ—তব অদৃষ্টের কথা!"
"আমি বৎস, তোর আদি পিতা তাইমূর ;
সদা অনুগত তাঁর রাজীব-চরণে ;
বড় অনুগ্রহ তিনি করেন এ দাসে।
শুকতারা অস্তে গেলে, পোহালে এ নিশা
শিপ্রার প্রসন্ন বারি হবে কলঙ্কিত
কাফের শোণিত-স্রোতে, সে রক্ত-প্রবাহ
সিংহাসন-পথ তব দিবে প্রক্ষালিয়া
সার্দ্ধ শতবর্ষ তরে ; ধর এই অসি
উদ্ভাসিত মম করে যাহা এইক্ষণ—
উদ্ভাসিত ঘন-দামে যথা তড়িল্লতা।
ইহা'র সাহায্যে তুমি সমস্ত ভারত—
উত্তরে হিমাদ্রি হতে দক্ষিণে অর্ণব—
একছত্রে শাস, দমি দুরন্ত দ্বিষৎ ;
বীর অভিমানী দারা *—দুর্ম্মদ সমরে ;
পুত্র-সলেমান যথা নব করি-শিশু ;
মোরাদ অথবা সুজা এ অসি সমক্ষে
নারিবে তিষ্টিতে কেহ ক্ষণকাল তরে,
বিতাড়িত—পদানত—হত অবশেষে
হইবে বিক্রমে তব। রাজপুতনার

* আরাঞ্জীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা ও সুজা, কনিষ্ঠ মোরাদ।

মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম প্রতাপে প্রখর
ক্ষত্রিয়নন্দনগণ একে একে সবে
নমিবে তোমার পদে—রাজপদে তবে;
কেবল মারাট্টাদেশে উঠিবে জাগিয়া
নবীন কেশরী এক—হুহুঙ্কারে যার
সমস্ত মোগল রাজ্য হবে কম্পমান।
কিন্তু সাবধান, রাজনীতির কৌশলে
আনিবে তাহারে তুমি আপনার বশে।
আর এক কথা বৎস, বলিব তোমায়;
বীর তুমি তব পক্ষে নহে অসম্ভব
সাধিতে সে কাজ—কারারুদ্ধ করি তব
বিলাসী জনকে—অশক্ত ধরিতে যিনি
রাজদণ্ড এবে, প্রাচীন বয়স হেতু—
বসিবে ময়ূরাসনে, পরিয়া শিরসে
'রাজ-চক্রবর্ত্তী' লেখা উজ্জ্বল মুকুট।"
"যাই তবে নিজ স্থানে—অবসান নিশা,
কিন্তু মনে থাকে যেন 'সিংহাসন-পথ
পুষ্প-বিকীরিত, বৎস, নহে কদাচন,
অবশ্য কণ্টকে ক্ষত হইবে চরণ—"
চকিতে অদৃশ্য হ'ল সে দিব্য মূরতি।

চতুষ্পদ রাজ্য-বিভাগ।

চতুষ্পদ জন্তু সকল জীব অপেক্ষা বৃহদাকার, বলশালী ও ভয়ঙ্কর; সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, জলহস্তী, ভল্লুক ও জিরাফি ইত্যাদি এই শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয়। এই জন্তুদিগের আকার কত বড়, তাহা ইহাদিগের দেহের পরিমাণ দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। জিরাফি ২৮ মণ, গণ্ডার ৮৪ মণ, জলহস্তী ৯৮ মণ, হস্তী ১৫০ মণেরও অধিক। এই শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি



দেখিতে অতি সুন্দর, চিত্রিত জেবরা ও হরিণ প্রভৃতি উদাহরণ-স্থল। ইহাদিগের লঘু দেহ এবং উজ্জ্বল ও বিশাল চক্ষু পূর্ব্বদেশীয় কবিদিগের কাব্যে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। চতুষ্পদদিগের মধ্যে অনেকে সহজে পোষ মানে ও মানবজাতির অনেক প্রকার হিত সাধন করিয়া থাকে, যেমন গরু, ভেড়া, ছাগল ঘোড়া, উট ইত্যাদি। বিষুবরেখা হইতে কর্কট ও মকর সংক্রান্তি ছাড়াইয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত স্থানে অধিকাংশ বন্য জন্তু বাস করে এবং তাহাদিগেরই শরীরের পরিমাণ ও বল এবং প্রকৃতির নৃশংসতা অধিক দেখা যায়। অনেকের ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে যেখানে উদ্ভিদ্‌রাজ্যের অধিক শ্রীবৃদ্ধি, সেই খানেই বৃহদাকার জন্তু সকল স্থাপিত হইয়াছে, তাহা না হইলে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত না। এ মত সত্য হইলে আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে অধিক সংখ্যক এবং আফ্রিকায় অল্প সংখ্যক বৃহৎকায় বন্য জন্তু দৃষ্ট হইত, কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়।

ডারউইন সাহেব বলেন "বৃহদাকার জন্তু সকলের জন্য সমৃদ্ধ উদ্ভিদ্-রাজ্য আবশ্যক এই সাধারণ অনুমান-সিদ্ধান্তটী এক পুস্তক হইতে অপর পুস্তকে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে নিঃসন্দেহে অপ-সিদ্ধান্ত বলিয়া গণনা করি। এই ভ্রান্ত মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর পুরাবৃত্ত বিষয়ে গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ঘন নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে হস্তিযূথের অবস্থিতি দর্শন করিয়া এই কুসংস্কারটী জন্মিয়াছে বোধ হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে প্রতি পত্রে মরুভূমি অথবা বহুসংখ্যক বৃহদাকার জন্তুর বর্ণনা দেখা যায়। আফ্রিকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব তটে সুন্দর কানন আছে, তদ্ভিন্ন অন্যত্র উদ্ভিদ্ অতি বিরল। কিন্তু সেই সকল স্থানে জিরেফা, জলহস্তী, কুম্ভীর পালে পালে দৃষ্ট হইয়াছে।"

দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উদ্ভিদ্ দৃশ্য পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আফ্রিকা মরুভূমি হইলেও তত্রত্য জন্তুর আকার উর্ব্বর আমেরিকার জন্তু অপেক্ষা ২০ গুণ বৃহৎ। বৃহদাকার জন্তু যে মরুভূমিতে বাঁচিতে পারে, উষ্ট্র তাহার এক দৃষ্টান্ত। ইউরোপের নিম্নস্তরে অনেক বৃহৎ জন্তুর কঙ্কাল-

রুশের এবং সাইবিরিয়ায় গণ্ডারের দেহাবশেষ দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছিলেন, এক সময় উক্ত স্থান সকলের জলবায়ু উষ্ণতর ছিল এবং তথায় বৃহৎ অরণ্য সকলও ছিল, মহাবিপ্লবে জল বায়ুর বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অনাবশ্যক ও কাল্পনিক মাত্র। (ক্রমশঃ)

গয়সর।

(২০০ সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠার পর)

নব গয়সরের বাহ্য আকৃতি মহা গয়সর হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, কিন্তু ইহার প্রস্রবণ উহারই অনুরূপ। আইসলণ্ডবাসীরা ইহাকে 'ষ্টকার' নামেও অভিহিত করে, তাহার অর্থ 'তোলপাড়,' ইহার ভয়ঙ্কর উৎসরণ হেতু এই নাম হইয়াছে। ষ্টকার নামে আর একটী প্রস্রবণও নিকটে ছিল, ১৭৮৯ অব্দে এক ভূমিকম্প হইয়া তাহা হঠাৎ শান্ত ভাবাপন্ন হয় এবং সেই অবধি নব গয়সরের উৎপত্তি হয়। হেণ্ডারসন নামে এক সাহেব উভয় গয়সরের উচ্ছ্বাস ক্রিয়া যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"প্রাতে ৫টা বাজিয়া ১০ মিনিট হইলেই ষ্টকারের গভীর গর্জ্জন শুনিয়া আমাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রথমে ইহা হইতে কেবল বাষ্পোদ্গম হইতে লাগিল, ঠিক্ কোয়াটারের দাগে কাঁটা আসিলেই একটী ভয়ঙ্কর শব্দ হইল, যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ জলধারা স্তম্ভাকারে ৬০ ফিট উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল। সূর্য্য তখন একটী মেঘের আড়াল হইল, তখনকার প্রকৃতির দৃশ্য যে কি অদ্ভুত, বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু ষ্টকার ২০ মিনিট জল উদ্গীরণ করিতে না করিতে মহাগয়সর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা নব উষ্ণ প্রস্রবণের প্রতি এত মনোযোগ অর্পণ করিয়া তাহার খ্যাতি ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন বৃদ্ধ গা ঝাড়িয়া উঠিল এবং ঘন ঘন ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে লাগিল। সে এত অধিক পরিমাণে জল ও বাষ্প উদ্গীরণ করিতে লাগিল যে আমরা দূর হইতে দর্শন করিয়া আর তৃপ্ত হইতে পারিলাম না, কৌতূহল চরিতার্থ

করিবার জন্য নিকটে গেলাম। কিন্তু 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' অধিক বাড়াবাড়ি করিয়া আরম্ভ করিয়া মহা গয়সর ৪ মিনিটের মধ্যে থামিয়া গেল। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সমভাবে প্রায় ৬টা পর্য্যন্ত উৎসারিত হইতে লাগিল।"

হেণ্ডারসন একটী বড় আশ্চর্য্য কথা লিখিয়াছেন, ষ্টকারের কুণ্ডের মধ্যে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ছুড়িয়া তিনি ইচ্ছানুসারে এই নিদ্রিত দৈত্যকে জাগ্রত করিতে পারেন। তাহার উপরে ঢিল ছুড়িলে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রস্রবণ উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

আইসলণ্ড দ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্তে গয়সরের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, ইহা বড় আশ্চর্য্য। উত্তর ইউরোপের প্রথম ইতিহাসলেখক আরি ফ্রোড একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি গয়সরের অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন, তিনিও ইহার বিষয় কিছু বর্ণন করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্কালপোল্টের ধর্ম্মাধ্যক্ষ শোনসন ইহার বিষয় প্রথম প্রকাশ করেন, তৎপূর্ব্বে কোন আইসলণ্ডবাসী ইহার প্রসঙ্গ করে নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা অনেকে প্রতিপন্ন করিতে চান যে নবম শতাব্দীতে নরওয়েজীয় জাতি যখন এই দ্বীপে প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তখন এবং তৎপরে অনেককাল গয়সরের অস্তিত্ব ছিল না। এ যুক্তি ঠিক্ বোধ হয় না। ৭৯ সালে বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত হয়, পণ্ডিতবর প্লিনী তাহা দর্শন করেন, ইহাতে তাঁহার একটী পিতৃব্যেরও মৃত্যু হয় এবং তিনি তন্ন তন্ন করিয়া এই ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন, অথচ হার্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নামে দুইটী নগর এই ঘটনা দ্বারা যে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ তাঁহার বর্ণনামধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা বলিয়া ঐ নগর দ্বয়ের দুর্ঘটনার সত্যতা কে অস্বীকার করিবে?

উক্ত প্রস্রবণের কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করেন। কোন কোন পণ্ডিত বলেন ভূগর্ভের অভ্যন্তর-দেশ অগ্নিময় দ্রব পদার্থে পূর্ণ, তাহা সময় সময় আলোড়িত হইয়া তরঙ্গ উৎপাদন করে, সেই তরঙ্গাঘাতে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া উক্ত প্রস্রবণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। উক্ত জল অধিক উষ্ণ হইয়া বাষ্পাকারে উত্থিত হয়। সার সি লায়েল বলেন ভূগর্ভ মধ্যে গহ্বর আছে, তথায় জল ও বাষ্প উভয়ই সঞ্চিত হয়। সেই বাষ্পের

বেগ যখন এত প্রবল হয় যে জলকে সরাইয়া ফেলিতে পারে, তখনি তাহা বাহিরে নিঃসৃত হইয়া যায়। তাঁহার মতে পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে জল ফাটাল দিয়া প্রবেশ করিয়া ভূগর্ভস্থ গহ্বরে যায়, গহ্বরের নিম্ন হইতে বাষ্প উর্দ্ধগামী হইয়া যখন ঐ জলের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহার কিয়দংশ জলরূপে পরিণত হইয়া গহ্বরস্থ জলের তাপ বৃদ্ধি করে। গহ্বরের নিম্নভাগে এই জল অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে থাকে এবং গহ্বরের উপরিভাগে বাষ্প সঞ্চিত হয়। এই বাষ্প যত অধিক পেষিত হয়, তত ইহার বেগ বৃদ্ধি হয় এবং ইহার বেগে উত্তপ্ত জল অন্যদিকে ফাটালের মধ্য দিয়া উদ্‌গত হইতে থাকে। বাষ্পের উপর চাপ যত কমে ততই তাহা বিস্তারিত হয়, এবং উপরিস্থ আবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২ রা আশ্বিন শনিবার কলিকাতা সিটী-কলেজ গৃহে ফরিদপুর সুহৃদ সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হইয়া বালিকা ও মহিলাগণের পুরস্কার বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভার অধীনে এ বৎসর ১৯৮ ছাত্রী পরীক্ষা দিয়া ১২৭ জন উত্তীর্ণা হইয়াছেন। পরীক্ষার্থিনীদিগের মধ্যে অনেকে অতি প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গণিতে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের সচরাচর উন্নতি দেখা যায় না, কিন্তু সুহৃদ সভার পরীক্ষায় কয়েকজন শতকরা ৯০ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যা পাইয়াছেন। ফরিদপুরের ৪৪টী গ্রাম হইতে পরীক্ষার্থিনীর নাম গৃহীত হয়, ৪০ বৎসরেরও অধিক বয়সের একটী বিধবা রমণী পরীক্ষার্থিনী হইয়াছিলেন, ইহা অত্যন্ত উৎসাহকর। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার উন্নতি কামনা করি।

২। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর গত ১৩ই আগষ্ট ঢাকা ইডেন স্ত্রী-বিদ্যালয় দর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। মধ্যপ্রদেশের মিবার জেলায় কতকগুলি পাহাড় হঠাৎ মৃত্তিকার মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। বোধ হয় ভূমিকম্প হইয়াছিল, কিন্তু কেহ টের পায় নাই।

৪। সুইটজার্লণ্ডের বরন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ৪২১ জন ছাত্র অধ্যয়ন

করিতেছে, তন্মধ্যে পুরুষ ৩৯৯, এবং স্ত্রীলোক২২ জন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ১৮ জন চিকিৎসা এবং ৪ জন দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন।

৫। চট্টগ্রামের বাবু আশুতোষ গুহ নামক এক যুবক ৫ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এক খানি ষ্টিমার প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার নিজের অনেক গুণপণা আছে।

৬। আমরা যার পর নাই আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি মান্দ্রাজে একটী ইউরোপীয় রমণী গবর্ণমেণ্টের মিটিয়রলজিকাল রিপোর্টার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইহার নাম কুমারী পগসন, ইনি বহুদিন রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদের সহকারীর কার্য্য করিয়াছিলেন। এ দেশে স্ত্রীলোকের এরূপ পদ-প্রাপ্তির এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

সমালোচনা।

'দূত' নামক সাপ্তাহিক পত্রের পুনরভ্যুদয় দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহা বিজ্ঞতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে।

'ধর্ম্মবন্ধু' নামে এক পয়সা মূল্যের পাক্ষিক পত্র গত ১লা আশ্বিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম ও নীতির হীনাবস্থাই আমাদিগের দেশের দুর্গতির মূল কারণ, তাহার নিরাকরণের চেষ্টা যত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করি।

বাবু উদয়চাঁদ সামন্তের স্বহস্ত প্রস্তুত গোলকের বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। তিনি সম্প্রতি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতি গোলক প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা দেখিতে বিলাতী গ্লোবের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে, গণিত-ভূগোলের রেখা সকল ইহাতে সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন রঙে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং জ্ঞাতব্য স্থানাদি বাঙ্গালা অক্ষরে অতি পরিষ্কৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। উদয় বাবু সম্পূর্ণ নিজের পরিশ্রমে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। দেশীয় এরূপ শিল্প-নৈপুণ্যের উৎসাহ দান করা সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য। এই গোলকের মূল্য ১১৲ টাকা মাত্র।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের স্তব।

হে গুণ-নিধান, পুরুষ প্রধান, সংসার বিধানকারী।
অখিল কারণ, ত্রিলোক তারণ, অনুপম রূপধারী॥
তোমার মহিমা কে করে বর্ণনা, নিগম আগম হারে।
ওহে বিশ্বপতি, আমি মূঢ়মতি, কি জানি বল তোমারে॥
যে দিগে নয়ন, হয় হে পতন, হেরি হে বিভব তব।
মরি কি স্বভাবে, স্বভাব স্বভাবে, রচিলে সুচারু ভব॥
এই চরাচর, ভূচর খেচর, জলচর আদি যত।
সকলি তোমার, মহিমা প্রচার, করিতেছে অবিরত॥
এই যে গগণ, সহ তারাগণ, শোভা পায় রাতি দিবা।
বিচিত্র রচিত, রতন খচিত, চন্দ্রাতপ মরি কিবা॥
তব সিংহাসন, এ ভব-ভবন, সচিব কাল নিয়ত।
প্রকৃতি নায়িকা, কোকিল গায়িকা, আর শারীশুক যত॥
তোমার রচনা, করিছে বর্ণনা, হে বিভু জগৎময়।
এই প্রভাকর, আর নিশাকর, তোমার প্রদীপদ্বয়॥
এই সমীরণ, জগত জীবন, তোমার বীজনকারী।
পদার্থ সকল, অচল সচল, সদা তব কর্ম্মচারী॥
মানব নিকর, বুদ্ধির সাগর, হয়ে তোমার কৃপায়।
পাইয়া জীবন, না করে পালন, তব আজ্ঞা সমুদায়॥
তোমার প্রভাবে, তিলেক না ভাবে, সদত বিভবে মত্ত।
বাক্‌শক্তি ধরে, বর্ণন না করে, তব প্রকৃতির তত্ত্ব॥
পাইয়া চরণ, না করে ভ্রমণ, সাধিতে জীবন ব্রত,
পাইয়া নয়ন, না করে দর্শন, তোমার মহিমা যত।
পেয়ে তোমাধন, না করে যতন, রাখিতে হৃদয়-ঘরে,
লভিতে কাঞ্চন, অতি তুচ্ছ ধন, সদা মরে চিন্তা করে॥

শ্রীগোলাপ কুমারী ঘোষ।
সাং গড়পার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০২ সংখ্যা। } কার্ত্তিক ১২৮৮—নবেম্বর ১৮৮১। { ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম মাদাগস্কার দ্বীপের রাজ্ঞী তাঁহার রাজ্যে অহিফেনের ব্যবসায় না হইতে পারে, তজ্জন্য নিম্নলিখিত আদেশ ঘোষণা করিয়াছেনঃ—

"মাদাগাস্কার রাজ্যে পোস্তের চায নিবারিত হইল, যে কেহ এ নিয়ম ভঙ্গ করিবে, তাহাকে ১০০ ডলার মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে—দিতে না পারিলে প্রত্যেক ।৵ আনা বাকীর জন্য একদিন করিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।"

আমরা শুনিলাম উক্তরাজ্যে গাঁজা ও মদের বিরুদ্ধেও আইন হইয়াছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কবে দেশের অশেষ অমঙ্গলের কারণ মাদকতা নিবারণে এইরূপ যত্নবান্ হইবেন ?

কলিকাতার মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতালে স্ত্রীলোক এবং শিশু সন্তান দিগের ক্লেশ হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার কিছু দক্ষিণ পশ্চিমে একটী অতি বৃহৎ ও সুন্দর চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাতে যেরূপ অনেক টাকা ব্যয় হইতেছে, সেইরূপ ইহাদ্বারা যে বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। এই গৃহের পারিপাট্য সাধনের জন্য ৩০ সহস্র

টাকার প্রয়োজন, তাহা সাধারণের নিকট চাঁদা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা আশা করি দানশীলা মহিলাগণ এ শুভকার্য্যে সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

মান্দ্রাজে একটী প্রথা আছে বালিকাবিদ্যালয়ে বালকেরা এবং বালকবিদ্যালয়ে বালিকারা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ১৮৭৮-৭৯ সালে ৫৫৪টী বালক এবং ৮৩৫৯টী বালিকা এইরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছে। মান্দ্রাজস্থ বালিকাদিগের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় সংখ্যা তত অধিক নহে, মুসলমানদিগের মধ্যে ইহা আরও অল্প। ১৮৭৫ সালে আরকটের রাজকন্যা একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহার নাম হোবার্ট স্কুল। মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড হোবার্টের স্মরণার্থ ইহার এই নাম হইয়াছে। তাঁহার পত্নী ইহার সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগিনী। লেডী হোবার্ট ইহার উন্নতি কল্পে ১০,০০০ টাকা এবং আরকট রাজকন্যা ৭০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য আছে। এ বিদ্যালয়টী তত্রত্য মুসলমান বালিকাদিগেরই জন্য।

গত ২৭এ আগষ্ট মহাসভা পার্লেমেণ্টের অধিবেশন হইয়া আগামী ১২ই নবেম্বর পর্য্যন্ত তাহা বন্ধ রহিয়াছে। বন্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডেশ্বরী যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারাংশ এই:—

"বিদেশীয় রাজাদিগের সহিত আমার সদ্ভাব ও আন্তরিক প্রীতি সম্বন্ধ আছে। গ্রীশের সীমা লইয়া তুরুষ্কের সহিত যে বিবাদ হয়, তাহা মিটিয়াছে। টিউনিস ও ট্রিপলির শান্তি সম্বন্ধে ফ্রান্স আশ্বাস দিয়াছেন। কান্দাহার হইতে ইংরাজ সৈন্য সকল প্রত্যানীত হইয়াছে, আমীর ও য়াকুব খাঁর মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে, তাহাতে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমার শান্তি ভঙ্গের কারণ নাই। আফগানস্থানের স্বাধীনতা রক্ষা করা যেমন আমার উদ্দেশ্য, তেমনি তথায় শান্তিস্থাপনের অবসর উপস্থিত হইলে আমি তাহার সহায়তা করিব। আয়লণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে আমার পার্লেমেণ্ট যেরূপ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশবাসীদিগের সেই পরিমাণে উপকার হইবে। আশা করি আয়লণ্ডের অবস্থা এরূপ উন্নত হইবে, যে তথায় বলপ্রয়োগপূর্ব্বক যে আইন জারী করিতে হইতেছে, তাহার আর প্রয়োজন হইবে না।"

গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিস সংক্রান্ত নূতন নিয়ম অবগত হইয়া আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ-হৃদয় হইলাম:—

ঊর্দ্ধকল্পে ৩১দিন অন্তর যে সকল সাময়িক পত্র বাহির হয় অর্থাৎ প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্র সকল ওজনে ৩ তোলার অধিক না হইলে এক পয়সা মাশুলে যাইবে, ১০ তোলা পর্য্যন্ত ৫০ মাসুল যাইবে। বিনিময়ে যে সকল পত্রিকা প্রেরিত হয়, তাহায় মাশুল লাগিবে না।

ডাকমাশুল কম হইলে যেমন পত্র প্রেরক ও গ্রাহকদিগের পক্ষে সুবিধা, গবর্ণমেণ্টেরও তাহাতে ক্ষতি না হইয়া বরং লাভ হইয়া থাকে, কারণ এইরূপ ব্যবস্থাদ্বারা অধিকসংখ্যক পত্র ডাকে যায়। ডাক মাসুল কমাইয়া ইংলণ্ডের পোষ্ট আফিসের আশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তথায় সংবাদ পত্র যেমন এক একখানি ৪০ হাজার, ৮০ হাজার করিয়া বিলী হয়, ডাকেচিটী পত্রও এত আদান প্রদান হয় যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গত বৎসর গ্রেট ব্রিটেনের পোষ্ট আফিসে ১২৭, ৩৭, ২৩, ৬০০ চিটী এবং ১২ কোটীর অধিক পোষ্টকার্ড ডাকঘর দিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষেও ডাকমাশুল যত কমান হইতেছে, চিটীর সংখ্যা তত অধিক বিলী হইয়া পোষ্ট আফিসের আয় বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

—

কাশীর গঙ্গার উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে। গঙ্গা ৩৫০০ ফিট প্রশস্ত এবং তাহার তীর বালুকাময়, এজন্য ইহার উপর সেতু নির্ম্মাণ করা কঠিন। সেতুর উপর দিয়া রেলওয়ে যাইবে এবং মনুষ্য ও গাড়ী প্রভৃতি চালাইবারও পথ থাকিবে। ইহার নির্ম্মাণের ব্যয় ৪২,৫০,০০০ টাকা অনুমিত হইয়াছে।

—

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের মৃত্যুতে সমুদায় সভ্যজগৎ শোকাক্ত হইয়াছে। যে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার দীর্ঘকাল শত্রুভাব ছিল, সেই ইংলণ্ডের রাজপরিবার ইহাঁর মৃত্যুতে এক সপ্তাহ কাল শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন। মার্কিনদেশীয় এক দুরাত্মা কোন স্বার্

সাধনে বিফল মনোরথ হইয়া ইঁহাকে গুলি করে। তাহাতে প্রথমে জীবনাশা ছিল না, পরে চিকিৎসার গুণে কিছু দিন বাঁচিয়াছিলেন এবং এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন আশা হইয়াছিল। কিন্তু গুলির ঘা বৃদ্ধি হইয়া ইঁহার মৃত্যু সংঘটন করিল। ইনি যেমন বিদ্বান, রাজনীতিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণও ছিলেন। ইঁহাদ্বারা উচ্চতম পদের শোভা হইয়াছিল, অধিক দিন রহিল না, ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

ক্রোরীয়ান্ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

সুবিখ্যাত নবদ্বীপের অগ্নিকোণে কামারকুলি নামক ক্ষুদ্র গ্রামে কোন বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে ১১০০ সালে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন; যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমির উপস্বত্ব হইতে কোনরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। মাতা অতিশয় সাধ্বী ও পতি-পরায়ণা। গোবিন্দ বালক কালে যার পর নাই দুষ্ট ছিলেন, লেখাপড়ায় কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না, কেবল নানাবিধ দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতেন।

একদিন, বাল্য সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কে কি দিয়া ভাত খাইয়াছে, সেই কথা আরম্ভ হইল। সকলের কথা শেষ হইলে একটী বালক কহিল, "আমার মা যেমন লাউ চিঙড়ি রাঁধিয়া ছিলেন, তেমন লাউ চিঙড়ি তোমরা কেহই খাও নাই।" গোবিন্দ এই কথা শুনিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং মাতার নিকট লাউচিঙড়ি খাইবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। হাতে কপর্দ্দক মাত্র না থাকায় জননী বড় বিপদে পড়িলেন। গোবিন্দও "নাছোড়" হইয়া ধরিলেন। এই সময়ে হঠাৎ একজন মৎস্য বিক্রয়িণী তাঁহাদের বাড়ী উপস্থিত হইল। জননী কোন রূপে বালককে লাউ চিঙড়ি ভুলাইতে না পারিয়া কি করেন? ধারে মৎস্য ক্রয় করিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন "ফিরিয়া যাইবার কালে দাম লইয়া যাইও।" লাউ চিঙড়ির যোগাড় হইল দেখিয়া গোবিন্দ বড়ই

আনন্দিত হইলেন। সঙ্গিগণকে এই সংবাদ দিবার জন্য আবার পাড়ায় বাহির হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭।৮ বৎসর।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। জননী পাক প্রস্তুত করিলেন। মেছুনী পাড়ায় পাড়ায় মাচ বেচিয়া পয়সা লইতে উপস্থিত হইল। মা ঠাকুরানী কহিলেন,—"বাছা, কড়িত জুটাইতে পারি নাই,—কাল দিব,—আজ এস।" মেছুনি বিরক্ত হইয়া বকাবকি করিল,—গালি দিল। কেহ কেহ বলেন, মেছুনী রন্ধন করা মৎস্যই ফেরত লইয়া গিয়াছিল। কর্ত্তাটী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন। পুত্রের জন্য ছোট লোকের গালি খাইতে হইল বলিয়া গোবিন্দের উদ্দেশে গৃহিণীর সমক্ষে বহুতর তিরস্কার করিলেন। ইতিমধ্যে গোবিন্দ বাড়ী আসিয়া জননীর নিকট অন্ন চাহিলেন। জননীও তাঁহাকে খাইতে দিলেন। গোবিন্দ আহার করিতে করিতে কহিলেন "মা, মাছ কই?" জননী রোদন করিতে করিতে মেছুনীর বৃত্তান্ত কহিলেন। কেহ কেহ বলেন কর্ত্তার আদেশে গোবিন্দের পাতের এক পাশে জননী এক মুঠা ছাইও দিয়াছিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন, অর্থ না থাকা বড়ই ক্লেশের বিষয়। আহার ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মা, যদি টাকা রোজগার করিতে পারি, তবে বাড়ী ফিরিয়া আসিব; নহিলে জন্মশোধ বিদায় হইলাম, আমার জন্য ভাবিও না।" এই বলিয়া সেই আট বৎসর বয়স্ক বালক গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

গোবিন্দ কোথা যাইবেন,—কি করিবেন তাহার ঠিকানা ছিল না। ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটা তাল গাছে পাখীর বাসা হইয়াছে। পাখীর ছাঁ পাড়িবার জন্য গাছে উঠিয়া যেমন বাসায় হাত দিবেন, অমনি তাহা হইতে একটা সর্প বাহির হইয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। এমন অবস্থায় ভয়ে অভিভূত হইয়া গাছ হইতে পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। কিন্তু গোবিন্দ পড়িয়া না গিয়া সাপের গলা টিপিয়া ধরিলেন। সাপও লাঙ্গুল দ্বারা তাঁহার হস্ত জড়াইয়া ধরিল। গলা ছাড়িয়া দিলে সর্পে দংশন করে, এই জন্য লাঙ্গুলের এক এক পেঁচ যেমন খুলিতে লাগিলেন, তেমনি তালের খাঁজে কাটিয়া ফেলিয়া দিতে

লাগিলেন। তলা হইতে এক সন্ন্যাসী এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে গাছ হইতে নামিতে কহিলেন। গোবিন্দ সাপকে খণ্ড খণ্ড রূপে কাটিয়া তলায় ফেলিয়া দিয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন। সন্ন্যাসী গোবিন্দকে কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমার ভাল হইবে।" গোবিন্দ কহিলেন,—"যদি আপনি আমাকে পাখীর ছাঁ দিতে পারেন, তবে আমি আপনার সঙ্গে যাই।" সন্ন্যাসী পক্ষিশাবকের লোভ দেখাইয়া গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু দিন পরে সন্ন্যাসী ঠাকুর গোবিন্দকে মন্ত্র দিয়া কহিলেন, "তুমি যদি রীতিমত এই মন্ত্র যপ করিতে পার, তাহাহইলে অতিশয় বড় লোক হইবে; কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে।" কথিত আছে, এই সন্ন্যাসীর সহিত গোবিন্দ দিল্লী গমন করেন।

গোবিন্দ দিল্লী গিয়া পরম যত্নে অল্প দিনের মধ্যে আরবী ও পারসী ভাষায় উত্তমরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক দিন বাল্য স্বভাবের বশীভূত হইয়া আরবীয় সুললিত কবিতা গান করিতে করিতে দিল্লীর নগর পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাহা সম্রাটের বার বাঁইয়ার কর্ণগোচর হইলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করিলেন। দেওয়ান আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া গোবিন্দকে বড় ভাল বাসিলেন। আপনার আশ্রয়ে রাখিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ এইস্থানে থাকিয়া অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত নানা বিদ্যা ও বিবিধ বিষয় কার্য্য শিক্ষা করিলেন। দেওয়ানের অনুগ্রহে ক্রমে কাজ কর্ম্মও পাইলেন। এখানেই তাঁহার যাবতীয় ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত হইল। অনেকে সহায় নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন। কিন্তু প্রায়ই কেহ কাহার অকারণ সহায় হন নাই। দেওয়ানজী সহায় হইয়াছিলেন বলিয়াই যে, গোবিন্দের তাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল, তাহা নহে। গোবিন্দের গুণ ও ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, দেওয়ানজী তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। গোবিন্দের বিষয় ক্রমশঃ দেওয়ানজীর দ্বারা সম্রাটের গোচর হইল। তৎকালীন সম্রাট গোবিন্দকে দেখিতে চাহিলেন। দেওয়ানজী গোবিন্দের রাজ-দরবারে গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন, গোবিন্দ সম্রাট সাক্ষাতে গমন করিলে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতা দর্শনে তাঁহার

প্রতি সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ হইল। গোবিন্দের সমক্ষে "বাঙ্গালা,—বিহার,—উড়িষ্যা" এই তিনটী শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পদ সঞ্চালনে নিকটস্থ তিনটী তাকিয়ে স্থান ভ্রষ্ট করিয়া গোবিন্দকে বিদায় দিলেন। গোবিন্দ ইহার অর্থ কিছু বুঝিতে না পারিয়া দেওয়ানজীর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

গোবিন্দের "তিন তাকিয়ে ইলাম" হইয়াছে শুনিয়া দেওয়ানজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পূর্ব্বতন সম্রাটগণের সিংহাসনের নিকটেই কতকগুলি তাকিয়ে থাকিত এবং ঐ সকল তাকিয়ে এক এক সুবার নামে অভিহিত হইত। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্তরূপে তাকিয়ে সঞ্চালন করিতেন। তাকিয়ে সঞ্চালনের নাম, "তাকিয়ে ইলাম।" তাকিয়ে ইলামের অর্থ এই যে, যাহার উদ্দেশে কোন সুবার নাম করিয়া যে তাকিয়া সঞ্চালিত হইত, তাহার সেই সুবার কোন উচ্চ পদ পাইবার অধিকার জন্মিত। "তিন তাকিয়ে ইলাম" হওয়ায় গোবিন্দ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ক্রোরীয়ান্ (১) হইলেন। ক্রোরীয়ান্, নামে বাঙ্গালার সুবাদারের অধীন ছিলেন, কিন্তু তিনি একরূপ স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বস্থলীতে আসিয়া আপনার প্রধান কার্য্যস্থান নির্ণয় করিলেন। গঙ্গা গর্ভসাৎ হওয়ায় কাষার-কুলির বাটী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বস্থলীতেই বাস বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই বাটীর পূর্ব্ব দিক ব্যতীত অপর তিন দিকে গড় কাটিয়াছিলেন, পূর্ব্ব দিকে স্বয়ং ভাগীরথী গড়ের কার্য্য করিতেন। বাসবাটী ব্যতীত গঙ্গাতীরে অট্টালিকাময় ঠাকুর বাটী ছিল। ঠাকুর বাটীতে এক শত আটটী শিবমন্দির ছিল। তদ্ব্যতীত রাধাকান্ত, রাধাবল্লভ, কৃষ্ণদেব ও মদনগোপাল এই চারিটী দেব বিগ্রহ ছিলেন। গোবিন্দ দিল্লী হইতে দেশে আসিবার সময় তৎকালীন জয়পুর-পতির নিকট প্রথম বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। দেবালয়ের সহিত সংযুক্ত অতিথিশালা ছিল। গোবিন্দ, দেব সেবা ও অতিথি সেবা মহা সমারোহে

(১) রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রধান কর্ম্মচারী। রাজস্ব নির্ণয়, আদায়, তৎসংক্রান্ত মোকর্দ্দমা করা তাঁহার কার্য্য।

সম্পন্ন করিতেন। এ সকল ছাড়া, অন্যান্য সৎ বিষয়েও অজস্র দান করিতেন। পাঠিকাগণ, দেখ! গোবিন্দ কিরূপে আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বহইতেই বঙ্গদেশ দ্বাদশটী ক্ষুদ্র রাজ্যে (২) বিভক্ত ছিল। এক এক জন রাজা ঐ সকল রাজ্য শাসন করিতেন। ঐ বার জন রাজার বারটী বাসা বাটী ছিল। রাজগণের কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব প্রভুর রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ জন্য ঐ সকল বাটীতে বাস করিতেন। ক্রোরীয়ানগণের সহিত সাক্ষাৎ মানসে কখন কখন স্বয়ং রাজারাও পূর্ব্বস্থলীতে আসিয়া প্রয়োজন মতে ঐ সকল বাটীতে অবস্থিতি করিতেন।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, ও বৈদিক এই তিনটী শ্রেণী আছে। ইঁহাদিগের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য কিছুই নাই বলিলেই হয়; তথাপি এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষরূপে আহার ব্যবহার কি বিবাহাদি প্রথা প্রচলিত নাই। অথচ ইহাদিগের মধ্যে এক শ্রেণী আর আর এক শ্রেণীর অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের জাতিপাত হয় না এবং রাঢ়ীয় ও বৈদিকের মধ্যে গুরু শিষ্যের প্রথাও প্রচলিত আছে। এমন স্থলে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি প্রথা প্রচলিত না থাকা অন্যায়। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে পারিলে ব্রাহ্মণজাতির বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। এই বিবেচনায় গোবিন্দ স্বয়ং তিন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার এই তিন পত্নীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বৈদিকী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ব্যতীত আর কোন সন্তানই জীবিত ছিল না। ঐ পত্নীর গর্ভে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিয়া ছিল; জ্যেষ্ঠের নাম রূপরাম, কনিষ্ঠের নাম মুকুট রাম। বোধ হয়, কর্ম্মসূত্রে, রাজসংসার হইতে 'রায়' উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বংশীয়েরা রায় বলিয়াই

(২) বর্দ্ধমান, যশোহর, পাটলি, কৃষ্ণনগর, সাতসইকে, সমুদ্রগড়, আশাস কিতব, বঙ্কপুর ইত্যাদি।

খ্যাত হইয়াছিলেন। এই কার্য্য দ্বারা গোবিন্দের বিশেষ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

কথিত আছে গোবিন্দ কোন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে আহ্নিক পূজাদি করিতেন। একদা সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি আহ্নিক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না। পরে পরিবারেরা দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখে, তিনি ছিন্নমস্তক হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, এই জন্য তাঁহার ঐরূপে মৃত্যু হইয়াছিল। অপরে কহেন, মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে এক জন মুসলমান নবাবের সহিত তাঁহার মনোবাদ হয়, সেই নবাব কর্তৃকই তাঁহার ঐরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছিল। যে রূপেই হউক, তাঁহার শৈশব গুরু সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল। সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইবার কিছু পূর্ব্বে এই ঘটনা হয়।

পূর্ব্বস্থলীতে গোবিন্দ চক্রবর্তীর ভদ্রাসন মহা সমৃদ্ধির সহিত নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাসবাটী, দেবায়তন, কাছারী বাড়ী, নহবৎখানা, হাওয়াখানা, ইত্যাদি নানাবিধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সমস্ত অট্টালিকাই, এক অত্যুচ্চ দুরারোহ প্রাকারে বেষ্টিত ছিল। তাহাকে "চৌদানী" কহিত। পাঠান জাতীয় সৈনিকেরা বাটীর দক্ষিণদিকস্থ তোরণ দ্বার রক্ষা করিত। উত্তরে বাগদী জাতীয় তীরন্দাজ ও তলোয়ারবাজ চোয়াড়েরা থড়কী দ্বার রক্ষা করিত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অন্যান্য কর্ম্মকর ও কায়স্থাদি জাতির বাসাবাটী সকল অবস্থিত ছিল। কালক্রমে ঐ সকল জাতি তত্তৎ স্থানের অধিবাসী হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি পূর্ব্বস্থলীতে ঐ সকল অধিবাসীর অবশেষ বর্তমান আছে।

গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপরামের গোপাল রায়, চাঁদরায়, বেণীরায় এবং কেশব রায় নামে চারিটী পুত্র হয়। ঐ বেণী রায়ের বংশে সূর্য্যকুমার রায় নামক একটী স্ত্রীপুত্র, বিহীন পুরুষ ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন। তাঁহার দ্বারাই গোবিন্দ চক্রবর্তীর জীবন চরিত সঙ্কলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকা সকলের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পূর্ব্বস্থলীর গঙ্গাতীরে

দৃষ্ট হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, গোবিন্দের তাদৃশী উন্নতি, তাঁহার জনক জননী দেখিতে পান নাই।

পাঠিকাগণ, দেখ! গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জীবন-চরিত কেমন অপূর্ব্ব! অধ্যবসায়, সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মাবলম্বন এই কয়টী গুণ থাকিলে মানুষের কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা দেখ।

চাঁদবিবি।

(২০১ সংখ্যা পৃষ্ঠার পর।)

মোগল সৈন্যদিগের প্রতিগমনের অল্পকাল পরেই পুনরায় কলহ আরম্ভ হইল। সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহম্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে চাঁদবিবি আহম্মদ নগরের প্রধান সচীবের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দুর্নীত ব্যক্তির স্বার্থপরতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারাই আহম্মদ নগর রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইল। এই ব্যক্তি গোপনে গোপনে চাঁদবিবির বিরুদ্ধে নানা প্রকার চক্রান্ত করিতে লাগিল এবং স্বদেশ-দ্বেষী জঘন্য অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য সম্রাট-কুমার মুরাদের শরণাপন্ন হইল। এই সময়ে বেরার দেশের সীমা লইয়া দাক্ষিণাত্যবাসী রাজাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল। সম্রাট-পুত্র মুরাদও এই সময়ে লিপ্ত ছিলেন; সুতরাং তিনি মহম্মদ খাঁর প্রার্থনানুসারে আহম্মদ নগরে গমন করিতে পারিলেন না। এক শত্রুকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া বিজয়পুর, আহম্মদ নগর ও গোলকণ্ডার রাজা একতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং মোগল সৈন্যদিগকে নর্ম্মদা নদী পার করিয়া দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন। গোদাবরী নদী তীরে মৌনপত্ত নামক স্থানে মোগলদিগের সঙ্গে একটী যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় পরাজয় হয় না; অথচ উভয় পক্ষই বলিল যে অপর পক্ষ পরাজিত হইয়াছে। আত্ম-কলহ প্রযুক্ত এই সময়ে মোগল সৈন্যদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, অবশেষে আকবর সাহ স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিনি আপন

পুত্র দানিয়াল ও জনৈক কর্ম্মচারীর অধীনে আহম্মদ নগর আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তৎকালে গৃহবিচ্ছেদ দ্বারা আহম্মদ নগর রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। মহম্মদ খাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া প্রধান প্রধান সেনাপতিগণও স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিল। রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান লোক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সকলেই স্বার্থপরতায় অন্ধ; দেশের হিতাহিতের প্রতি কাহার দৃক্‌পাত নাই, কি রূপে আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে এই প্রশ্ন লইয়াই সকলে ব্যস্ত। এই গৃহ বিচ্ছেদেই আহম্মদ নগর শত্রু-করগত হইল। মোগলদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিবা মাত্র আহম্মদ নগরের প্রধান প্রধান সেনাপতি সসৈন্যে রণক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইল। এরূপ ভয়ানক বিপদ দেখিয়া চাঁদবিবি মোগলদিগের সহিত সন্ধি প্রস্তাব করিলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বদেশীয় স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক শত্রুগণ একটী ভয়ানক নিষ্ঠুরতার কার্য্য সম্পন্ন করিল। কতকগুলি সৈনিক চাঁদবিবির শত্রুদিগের কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল ও ঘাতকের ন্যায় তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। পামরগণ আপনাদিগের পদে আপনারাই কুঠারাঘাত করিল; স্বদেশের স্বাধীনতা হারাইল ও দেশের একটী অমূল্য রত্নকে পদতলে নিষ্পেষিত করিল। বিশ্বাসঘাতকদিগের পাপাচারের ফল শীঘ্রই ফলিল; মোগল সৈন্য উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অধিকতর উৎসাহ ও পরাক্রমের সহিত আহম্মদ নগর আক্রমণ করিল, রাজ্য সম্পূর্ণ রূপে মোগল সিংহের পদানত হইল। বালক রাজা বন্দী-দশায় গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরিত হইলেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আহম্মদ নগরের সৌভাগ্য-শশী চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। আমরা চাঁদবিবির সংক্ষেপ জীবনী শেষ করিলাম।

চাঁদবিবি একটী রমণী রত্ন। ভারতে যে সকল বীরাঙ্গনা স্বদেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যাঁহারা দেশ-হিতৈষিণীর অদ্ভুত জীবন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, চাঁদবিবি যে সে সকল বীর-বালার মধ্যে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এ বিষয়ে কে সন্দেহ করিবেন?

ইহাঁর অসাধারণ বীরত্বের বিষয় পাঠ করিয়া কে না মোহিত হয়? মোগল সম্রাট্‌ কত পরাক্রান্ত সাহসী নরপতিকে সহজে পদানত করিয়াছেন,

কিন্তু যে রমণীশ্রেষ্ঠ সেই মোগল-রাজকে পরাভূত করিয়াছেন, তাঁহার বীরত্ব, সাহস, তেজ ও শক্তি কি অদ্ভুত নহে? ভারত-রমণী স্বহস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া অমিততেজে সমরক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, আপন সেনাদিগকে চালাইতেছেন, ইহা কি সামান্য বীরত্বের কার্য্য? চাঁদবিবির কর্ত্তব্য-পরায়ণতা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার হস্তে আহম্মদনগরের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার ভার অর্পিত হইয়াছিল; এই কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সাধন করিবার জন্য কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, এবং এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি নিঃস্বার্থভাবে রাজ্যের হিতসাধনে যত্নবতী ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা না থাকিলে একজন পরাক্রান্ত সম্রাটের সহিত শত্রুতা সত্ত্বেও এরূপ রাজ্যশাসন করিতে পারিতেন না। দুঃখের বিষয় যে চাঁদবিবির জীবনী লিখিয়া আমাদের তৃপ্তি হইল না। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ইতিহাসেও চাঁদবিবির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। এমন কি, আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চাঁদবিবির জন্মকাল স্থির করিতে পারিলাম না।

স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়াছিলাম।

একদিন স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ঘুমের ঘোরে কি দেখিলাম তাহা ভাল করিয়া তখন বুঝিতে পারিলাম না। সে মানুষী না দেবতা? মানুষী ত কখনই নয়। তাহার মুখপদ্মে যে গাম্ভীর্য্য, যে সহিষ্ণুতা, যে বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা শোভিতেছিল, মানুষীর পক্ষে তাহা কি কখন সম্ভব? তবে কি সে দেবতা? তাহাও ত নয়। আহা! তাহার মুখ খানি যে ম্লান, চক্ষু দুটি যে ছল্ ছল্ করিতেছিল। সুরলোকে যে সকল কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, তাহাদের মধ্যে ত শোককীট কখন প্রবেশ করে না। তবে সে দেবতাও নয়, মানুষীও নয়। কি তবে? আমি তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না। ঘুমের ঘোরে আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। আর, আমি ভাল

করিয়াও তাহাকে দেখি নাই। একবার শুধু খর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, অমনি তাহার চক্ষু দুটি আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিল। সেই অবধি তাহার মুখের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা করিতে লাগিল। তবে কেমন করিয়া বলিব সে কি?

সে কি সন্ন্যাসিনী? কৈ, তাওত নয়। তাহার মস্তকে জটাভার নাই, তাহার অঙ্গে ছাই ভস্ম নাই, তাহার পরিধানে গৈরিক রাগও নাই। গৃহস্থের বাটীতে গৃহলক্ষ্মী, গৃহস্থের সুখে তাহার সুখ, গৃহস্থের দুঃখে তাহার দুঃখ। কঠোর-হৃদয় সন্ন্যাসীর সহিত তাহার কোন সহানুভূতিই নাই। জগতের দুঃখে সন্ন্যাসীর হৃদয় কবে কাঁদিয়াছে? জগতের সুখের জন্য সন্ন্যাসীর হৃদয় কবে ব্যাকুল হইয়াছে? কিন্তু আমি যাহার কথা বলিতেছি সে যে সংসারের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধি চিন্তাতে দিবানিশি নিমগ্ন।—সন্ন্যাসিনী সে কখনই নয়।

তবে কি সে সংসারিণী?—না, তাও আমি বলিতে পারি না। এই বিপুল সংসারের চারি দিকে একবার চাহিয়া দেখ। সকলেই স্ব স্ব চিন্তায় ব্যস্ত। স্বার্থপরতা এই জগতের বীজমন্ত্র। এক জন মানুষ আমাকে দেখাইয়া দাও, যে প্রকৃতপক্ষে সংসারী অথচ স্বার্থশূন্য? কিন্তু আমি যাহার কথা বলিতেছি, তাহার অন্তরে স্বার্থচিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না। তবে তাহাকে সংসারিণী বলিব কেমন করিয়া? সংসার সুখে তাহার কোন অভিলাষই নাই। তাহার সোণার অঙ্গে অলঙ্কারের লেশমাত্র নাই; অথচ তাহার যে অলঙ্কার, তাহা আর কাহার অঙ্গে দেখিতে পাইবে না। সে অলঙ্কার স্বর্গীয় পবিত্রতা। তাহার প্রতি লোমকূপ হইতে সেই পবিত্রতার সুস্নিগ্ধ জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে, কিন্তু সংসার-চিন্তায় যাহাদের অন্তশ্চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহারা সে জ্যোতি কোন কালেও দেখিতে পায় না।

সে সন্ন্যাসিনী নহে; সংসারিণীও নহে। তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। আমি নীচাশয় স্বার্থপর ক্ষুদ্র মনুষ্য। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। তবে আমি সেই স্বপ্নে তাহার সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ যাহা দেখিয়াছি, ক্রমশঃ বলিতেছি।

আমার বোধ হইল রাত্রি অনেক হইয়াছে তৃতীয় প্রহরের কম নয়। চারিদিক্ নিস্তব্ধ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কেবল একটী ঘরের ভিতরে একটা ক্ষীণপ্রভ আলোক জলিতেছে। সেই ঘরের একপার্শ্বে একটী শয্যায় রহিয়াছে। তাহাতে অস্থিচর্ম্মাবশেষ এক হতভাগা বিছানার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, এবং তাহার পার্শ্বে সেই প্রসন্নমূর্ত্তি নিদ্রা ও বিশ্রাম ভুলিয়া গিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে। আহা! মুখখানি কি গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ; চক্ষুদুটী কি স্থির! আর সেই বিস্ফারিত চক্ষুদুটী কি স্নেহের সহিত রোগীর মুখের উপরে চাহিয়া রহিয়াছে। মানুষের হৃদয়ে কি এত ভালবাসা ধরিতে পারে? মানুষের হৃদয় কি পরের দুঃখে এত কাতর হয়? সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিশীথে সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন কোন দেবতা মনুষ্যের দুঃখে কাতর হইয়া মর্ত্ত্যালোকে আসিয়াছেন। নহিলে সেই স্নেহ, সেই পরদুঃখ-কাতরতা, সেই সহিষ্ণুতা পৃথিবীতে কেমন করিয়া আসিবে?

ব্যাধির যন্ত্রণায় সেই হতভাগা ব্যক্তি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে কারুণ্য প্রতিমা তাহার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে সে শত্রুজ্ঞান করিয়া গালিবর্ষণ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে সেই হিতকারিণীর হৃদয় অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার চক্ষুদুটী অধিকতর করুণ ভাব ধারণ করিতেছে। গালিবর্ষণ করিয়াও সে ক্ষান্ত নহে। হতভাগা অবশেষে তাহার দুর্ব্বল হস্ত তুলিয়া তাহার প্রিয়কারিণীকে সজোরে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার অঙ্গে না লাগিয়া তাহা সজোরে শয্যার কাষ্ঠে গিয়া লাগিল। অমনি সেই মৃতপ্রায় হতভাগা মুখবিকৃতি করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। আর সেই কারুণ্যময়ী—আহা তাহার মুখ খানিতে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব দেখা দিল! সেই অস্থিচর্ম্মাবশেষ হাতখানি সে ব্যাকুল হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিল, তাহার বক্ষদেশ মুহুর্মুহু স্ফীত হইতে লাগিল, ও তাহার নয়নদ্বয় হইতে অনবরত বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

সেই স্বর্গীয় ভালবাসা, সেই পরদুঃখ-কাতরতা দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। আমি

সেরূপ শান্তি কখনও অনুভব করি নাই। আমার বোধ হইল তাহার নিঃশ্বাস বায়ুতে সে স্থানটী যেন পবিত্র হইয়াছে, ও তৎসান্নিধ্যবশতঃ আমার হৃদয়ের সমুদয় পঙ্কিল চিন্তা এককালে বিদূরিত হইয়াছে। ইতি মধ্যে হঠাৎ সেইদৃশ্য ইন্দ্রজাল প্রভাবে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আমার বোধ হইল সন্ধ্যার সমাগম হইয়াছে, আকাশে দুই একটী তারকা দেখা দিতেছে, ও মৃদুবাহী সন্ধ্যা সমীরণ বৃক্ষপত্রকে ঈষৎ সঞ্চালিত করিতেছে। সেই সান্ধ্য অন্ধকারে একটী রমণী তাহার বালককে শাসিত করিতেছে। বালকটি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছে। সে চিৎকার করিতেছে, এক এক বার ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, উঠিয়া তাহার জননীকে প্রহার করিতেছে, ও পুনরায় ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। মাতা যত তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই তাহার কোপ বৃদ্ধি হইতেছে। এমন সময়ে সেই প্রশান্তমূর্ত্তি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। এবার তাহার সেই মুখখানিতে স্নেহমাখা একটু হাসি দেখিলাম। সে তাড়াতাড়ি বালকের কাছে আসিল, এবং জোর করিয়া তাহাকে ভূমিহইতে তুলিয়া ক্রোড়ে লইল, ও বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। সেই চুম্বনের কি আশ্চর্য্য গুণ! মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই দুষ্ট বালকের জলন্ত ক্রোধ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল, এবং তাহার স্কন্ধে বাহু সংলগ্ন করিয়া সে তাহার বক্ষোপরি নিদ্রা যাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কি আশ্চর্য্য! মাতা বালককে শান্ত করিবার জন্য এত চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সে থামিল না; বরং উত্তরোত্তর তাহার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। আর দ্বিতীয়া রমণী কে, যে তাহার স্পর্শমাত্রে বালকের সমুদায় কোপ একেবারে নির্ব্বাণ হইল, ও সে মুহূর্ত্তেক মধ্যে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল? মাতার অপেক্ষা বালকের সে অধিক প্রিয় তাহার ভালবাসা কিরূপ? আমি বিস্মিত হইয়া এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে আর একটী দৃশ্য দেখিলাম।

সেই সন্ধ্যা, সেই বালক ও তাহার জননী হঠাৎ অদৃশ্য হইল; ও তৎপরিবর্ত্তে এক বিকটাকার শীর্ণকায় ব্যক্তি দেখিলাম। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষততে পরিপূর্ণ, ও সেই সকল ক্ষত হইতে দিবানিশি পূয় ও দুর্গন্ধ বহির্গত

হইতেছে। কাহার সাধ্য যে তাহার কাছে গিয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকে? তাহাকে দেখিবামাত্র লোকে অন্য দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। এইরূপে সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কেবল একজন পারে নাই। তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, আমি কাহার কথা বলিতেছি। পরের দুঃখ ও যন্ত্রণা দেখিলে যে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যায়। পরের মঙ্গলের জন্যই যে সে পৃথিবীতে আসিয়াছে। সে তবে কেমন করিয়া সেই হতভাগাকে পরিত্যাগ করিবে। তাহার মনে কি কিছুমাত্র বিকার নাই? সেই দুর্গন্ধ তাহার পক্ষে আতর গোলাপের গন্ধের অপেক্ষাও প্রীতিকর। সেই পূয ও রক্তে পরিপূর্ণ ক্ষত সে কত যত্নের সহিত পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। দেখিলে বোধ হয় তাহাতে তাহার যে সুখ, তেমন সুখ আর কিছুতেই সে পায় না।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমার হৃদয়ের ভিতরে কেমন কেমন করিতে লাগিল। আমি তখন বুঝিতে পারিলাম মানুষে মানুষে—আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানুষে, আর সেই মূর্ত্তিমতী স্নেহ ও বিশুদ্ধতায়—প্রভেদ কত। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার তাহার চরণে নিপতিত হইয়া অহঙ্কার চূর্ণ করি, একবার তাহার পাদস্পর্শে অপবিত্র দেহ পবিত্র করি। এই উদ্দেশ্যে আমি যেমন অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলাম, আর অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখি চারি দিক্ অন্ধকারে পরিপূর্ণ—আর কিছুই নাই!

নিদ্রাভঙ্গ হইল, ও সেই স্বপ্নে যাহা যাহা দেখিলাম সমুদয় অন্ধকারে মিশিয়া গেল। কিন্তু তাহার এক প্রতিরূপ অদ্যাবধি হৃদয়ে সজীব রহিয়াছে, এবং যত দিন বাঁচিব—রহিবে। ভগ্নি! সেই স্বপ্নদৃষ্টা প্রশান্ত মূর্ত্তি কে? তাহা এইবার বলিব। তাহার নাম আজন্ম-বিধবা-হিন্দু-রমণী। প্রত্যেক হিন্দু গৃহে সে গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা। সে তোমার আমার সুখের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছে। সূর্য্যোদয় হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার মুখে একটী কথা নাই, কেবল তোমার আমার সুখের জন্যই অনুক্ষণ ব্যস্ত রহিয়াছে। আর—বলিতে লজ্জা করে—তোমার আমার হস্তেই তাহার সমুদয় দুর্গতি! এক খণ্ড বস্ত্রের, ও এক মুষ্টি অন্নেরও সে অধিকারিণী নহে। সে সকলের, কিন্তু কেহ তাহার নহে। সে সকলের জন্য

লালায়িত, কিন্তু তাহার জন্য কে কবে ভাবিয়া থাকে?—ছি ছি, জগতে যাহা যত উৎকৃষ্ট, তাহারই তত দুর্গতি!

পরলোক বাসিনী।

১

ধীরপদে বিভাবরী নামিল ধরায়,
প্রসারিয়া শ্যামাঙ্গিনী তামস-অঞ্চল;
সুনীল কবরী ঘেরা তারকা-মালায়,
সীমন্তে খদ্যোতপাঁতি করে ঝলমল।

২

মলয় মারুত ছলে ছাড়িছে নিঃশ্বাস,
ফুলের সৌরভে মিশি শীত সুরভিত;
আতর গোলাব মাখি, পরি নীল বাস,
সুরঙ্গিণী রঙ্গস্থলে যথা উপনীত।

৩

একাকী শুইয়া আমি প্রকোষ্ঠে আমার;
কাতরে ঢালিয়া অঙ্গ পালঙ্ক-শয়নে,
ভাবী-ভূতপূর্ব্ব কথা; জলি অনিবার
কুহকিনী ভুজঙ্গিনী স্মৃতির দংশনে।

৪

শয্যা-পার্শ্বে রজতের শুভ্র শামাদনে,
জ্বলিছে সুগন্ধি দীপ স্নিগ্ধভাবে ধীরে;
শিখা তার বিচঞ্চল অনিল-তাড়নে,
প্রেতবৎ নাচে ছায়া কক্ষের প্রাচীরে।

৫

অর্গলে আবদ্ধ দ্বার—মুক্ত বাতায়ন,
সহসা সমীর-স্রোত হ'ল প্রধাবিত,

নির্ব্বাপিত দীপালোক, সমস্ত ভবন
তিমির-সাগরে ঘোর হ'ল নিমজ্জিত।

৬

চিন্তা-অবসন্ন-চিতে—মুদিত নয়নে
হেরিতেছি সেই মূর্ত্তি কল্পনার বলে,
যে মূরতি একদিন জাহ্নবী-পুলিনে
হেরেছি হইতে ভস্ম দুরন্ত অনলে।

৭

স্মৃতি-চিত্রপটে হায়! কল্পনা তুলিতে,
না পারি আঁকিতে আর সে মুখ মোহন,
পড়িনু মূর্চ্ছিত হ'য়ে শয্যায় চকিতে—
"প্রাণাধিকে—প্রিয়তমে—কোথায় এখন!"

৮

কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম বিহ্বল
নাহি জানি, পরে যবে হইল চেতন,
মেলিনু নয়ন ধীরে—একি—অচঞ্চল
সৌদামিনী—গৃহমাঝে—রমণী রতন।

৯

রূপের প্রভায় গৃহ হয়েছে উজ্জ্বল;
নাহি সে তিমির রাশি—নিশান্তে যেমন
উষার লাবণ্যে দীপ্ত হয় ভূমণ্ডল,
উদয়-অচলে যবে উদেন তপন।

১০

কোমল করুণাময় সস্নেহ নয়নে,
মম নেত্রে শান্তভাবে আছেন চাহিয়া;
স্বরগের শান্তি-ধারা এ দগ্ধ জীবনে,
বহুকাল পরে দেবি, দিলে গো ঢালিয়া।

১১

বিস্ময়-স্ফারিত-নেত্রে চাহি ক্ষণকাল,
চিনিলাম সেই মোর জীবন-তোষিণী,
সুখ-হীন সংসারের শোক দুঃখ-জাল
এড়ায়ে গেছেন যিনি—স্বরগ শোভিনী।

১২

উন্মত্ত—উচ্ছ্বাস-পূর্ণ অভাগা হৃদয়—
উন্মত্ত—মাতঙ্গ যথা বিমুক্ত-শৃঙ্খল;
উচ্ছ্বাসে জলধি যথা হেরি চন্দ্রোদয়;
(আছে কি জগতে কেহ—কঠিন-শীতল

১৩

সিরেট প্রস্তর সম—হৃদয় যাহার
নহে বিগলিত হেন সুখের মিলনে ?)
লুটায়ে পড়িয়া দুটী চরণে তাঁহার
বলিলাম মুক্ত-কণ্ঠে কাতর বচনে—

১৪

"সতি—সাধ্বি চারুশীলে—এতকাল পরে
ভিখারী স্বামীরে তব পড়িল কি মনে ?"
কথা না হইতে সাঙ্গ, তিমির-সাগরে
জানি না সে দেবী-মূর্ত্তি মিশাল-কেমনে।

১৫

বুঝেছি—ধরণী-ধাম ছাড়িয়া পরাণী
লোকান্তরে গেলে চলে, তবুও সে জন
শোকার্ত্ত বান্ধবে শান্ত করিতে আপনি,
ছায়ারূপে নিশা-ভাগে দেন দরশন।

———

কেন এমন হইল ?

(২০১ সংখ্যা ১৭৯ পৃষ্ঠার পর।)

'কি হইল,ছেলেটা একেবারে গেল' এই বলিয়া নিত্যানন্দ বাবু হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নিকটস্থিত চৌকীতে বসিয়া পড়িলেন। এত শাসনে রাখিয়াও বিনোদকে বশে আনিতে পারিলাম না! ধর্ম্মে মতি হওয়া দূরে যাউক, সে কি না এখন বলে আমি ও সব কিছু মানি না। একটী কথা বলিতে গেলে মান্য করিয়া শোনা দূরে থাকুক, রাগিয়া বলে এমন করেন ত আমি পৃথক্ হইব। কেবল বাবুগিরিতেই মন। দান ধ্যান দূরে থাকুক, এত কষ্টে মানুষ করিলাম, আমাকে একটী পয়সা দিতেও কৃপণতা দেখায়। পদে পদে স্বার্থপর কপট ব্যবহার করে। হায়! আমার ভাগ্যেও এত ছিল! এত যত্নে শিক্ষা দিয়া শেষে কি না এই হইল। বলিতে কি নিত্যানন্দ বাবু ভাবিয়া হতবুদ্ধি যে তাঁহার সন্তান এ কুশিক্ষা কোথায় পাইল, সময় সময় বলেন অদৃষ্টের দোষ, নতুবা এমন কেন হইবে ?

কেবল শাস্তির ভয় দেখাইয়া, দিন রাত্রি প্রহার করিয়া, শিশুর হাস্য, ক্রন্দন বন্ধ করিয়া, স্বাভাবিক ভাবে তাহার সমুদয় মনোবৃত্তিকে কার্য্য করিতে না দিয়া নিয়ত দোষীর ন্যায় তাহার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার ও অবিশ্বাস প্রকাশ দ্বারা যদি সন্তানের শিক্ষার ও উন্নতিবিধানের সাহায্য হইত; ক্রমাগত শুষ্ক মৌখিক বাক্য দ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে এত দিন অনেক বড় লোক দেখা যাইত। কথার সময় দেবতা—কার্য্যকালে সংসারের সামান্য নীচাশয় মনুষ্য—সকল সময় উপদেশ, কাজের সময় বিপরীত আচরণ, যেখানে এরূপ দেখাযায়, সেখানে সন্তানের সুশিক্ষা কত আশাপ্রদ তাহা ভাবিতে অধিক আয়াস লাগে না। শত উপদেশ অপেক্ষা একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত অধিকতর ফলোপধায়ী, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যে গৃহে সন্তান পালনের, সন্তানের শিক্ষার প্রণালী প্রহার, তাড়না, ভয়-প্রদর্শনে পর্য্যবসিত, সে গৃহের সন্তান বয়ঃপ্রাপ্তে কি হয় অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন।

প্রচণ্ড ঝটিকাঘাতে কোমল কোরক অকালে দলিত হইলে যেমন মাধুর্য্যহীন হইয়া পড়ে, সুকুমার কান্তিতে বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার সমুদয় সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ শিশু-হৃদয়ে অপরিস্ফুট কোমলভাব সকলও প্রথম হইতে কঠোর ব্যবহার পাইয়া সম্যক্ বিকশিত হইতে পারে না। শিশুর বিশ্বাস পূর্ণ ক্ষুদ্র হৃদয় যত যত্ন, যত আদর, যত স্নেহ পাইবে, তাহার সারল্যের মধুরতা ততই মনোহরভাবে স্ফুরিত হইয়া দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। রাগের রুক্ষশাসন কোমল স্বভাব শিশুর জন্য নহে, স্নেহের বাক্য, সহানুভূতির দৃষ্টি, জীবন্ত দৃষ্টান্ত ইহাই শিশু জীবন গঠনের প্রকৃত উপাদান। নিজের দৈনিক জীবনের সদ্ভাবে তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করাই তাহাকে প্রকৃত মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিবার স্থায়ী উপায়। ইহাদ্বারাই তাহার কোমল মনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বয়োবৃদ্ধি সহকারে স্নিগ্ধতর হয়। কেবল কর্কশ ব্যবহার, অবিশ্বাসের ভাব, অকারণ রাগ প্রভৃতির মধ্যে বর্দ্ধিত সন্তান বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদায়ই শিক্ষা করে এবং সময় আসিলে নিজের জীবনে তাহারই দৃষ্টান্ত দেখায়। শিশুর বিলক্ষণ মানাপমান বোধ আছে। বাল্যকাল হইতে সামান্য জীবের ন্যায় ব্যবহৃত, উপেক্ষিত হইলে নিজের মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, সুতরাং অন্যের প্রতিও সেইভাব আসিয়া পড়ে। কেন এমন হইল? পাঠিকা যদি এ কথার উত্তর জানিতে উৎসুক হয়েন, তাহাহইলে আমার উত্তর এই :—অতি শাসন, কঠোর আচরণ সন্তানের হৃদয়কে অস্বাভাবিক করিয়া দিয়াছে। অল্প বয়সে ভয়ের আধিক্যহেতু মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে সাহস ছিল না; যেই ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, নিজমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া অসুচিত শিক্ষার বিষময় ফল উৎপাদন করিল। যাঁহারা মনে করেন, কেবল শাসনে রাখিলে সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয়, তাঁহারা এই প্রস্তাবটি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ভ্রমণকারীর পত্র।

বম্বে।

(২০১ সংখ্যা ১৮৬ পৃষ্ঠার পর।)

এই দৃশ্য দেখিয়া আমি সমুদ্রতীরে বম্বের গড়ের নিকট কি কি আছে তাহা দেখিতে যাই। সমুদ্রের দৃশ্য তোমায় লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। যদি কখনও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন, তবে আশা করি, ঈশ্বর কৃপায় স্বচক্ষে এই সকল দেখিয়া সুখী হইবে। সমুদ্রতীর হইতে পুনরায় বড়বাজারের মধ্য দিয়া আসিয়া ডাকঘরের সম্মুখের রাস্তায় পড়ি। সেখান হইতে ট্রামওয়ে চড়িয়া বম্বের মিউনিসিপাল বাজার দেখিতে যাই। কলিকাতায় ট্রামওয়ে অল্পদিন হইল হইয়াছে; কিন্তু বম্বের ট্রামের বয়স প্রায় ৮।৯ বৎসর হইতে চলিল। দুই পয়সা দিয়া আমি ডাকঘরের নিকট হইতে বাজারে গেলাম।

বম্বের মিউনিসিপাল বাজারের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে এত প্রশংসার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজারের যে বাড়ী, তদপেক্ষা এখানকার বাজারের বাড়ী ছোট, এবং কলিকাতার বাড়ীটী যেমন সুসজ্জিত, এটী সেরূপ নহে। সর্ব্বপ্রথমে বাড়ীটীতে প্রবেশ করিয়াই ফলের বাজার দেখিতে পাইলাম। এখানকার কলা অতিশয় বিখ্যাত। খুব বড় বড় লাল কলা অনেক দেখিতে পাইলাম, অন্য রকম কলাও অনেক, কিন্তু শ্রীহট্টে যেরূপ কলা দেখিয়াছি, এখানকার কলা তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এখানকার জামরুল আমাদের জামরুল অপেক্ষা লম্বা, এবং আমাদের জামরুল যেরূপ শাদা বর্ণের, এগুলি সেরূপ নহে। এখানকার জামরুল লাল লাল, প্রথম দেখিয়া আমার জামরুল বলিয়াই বোধ হইল না। নূতন ফল বিবেচনা করিয়া দর করিলাম; আমার পোষাক দেখিয়া বোধ হয় অযথা দর বলিতে লাগিল—একটা দুপয়সা বলিল;—আমি অবাক্ হইলাম। আর এক দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি অনুগ্রহ করিয়া

৵০ যোড়া বলিল। আমি ৴১০ বলিলাম,—তাহাতেই দিল। খাইয়া দেখিলাম আমাদের জামরুল যেরূপ জলের মত, সেগুলি সেরূপ নয়। ইহাতে বেশ একটু টক স্বাদ আছে, এবং আমাদের জামরুল অপেক্ষা এখানকার জামরুল অন্ততঃ আমারত খাইতে ভাল লাগিল। এখন ভাদ্রমাসের প্রথম,—এই সময়ে শ্রীহট্টে পাকা কমলা লেবুর কথা দূরে থাকুক, বড় কাঁচা লেবুই পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে বহুল পরিমাণে লাল লাল বড় বড় সুপক্ক কমলালেবু দেখিয়া প্রথমতঃ আশ্চর্য্য হইলাম। কমলা-লেবুকে এখানে সাস্ত্রা বলে। এই সকল নাগপুর হইতে আসে, এবং রা— মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, এখানে নাকি কমলালেবু বারমাস পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যাহা পাওয়া যায়, তাহা নাকি একেবারে অযথা পরিমাণে মিষ্ট। কমলালেবু দেখিয়া যে শ্রীহট্টের লোকের স্বভাবতই তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ৵০ দুআনা দিয়া ছটো কমলালেবু কিনিলাম; বাসায় গিয়া খাইয়া দেখিলাম যে, এই সকল লেবু সহজেই শ্রীহট্টের লেবুর সমকক্ষ হইতে পারে। আমি এতদিন ভাবিতাম, বিধাতার কৃপায় শ্রীহট্টের কমলালেবু যে একবার খাইয়াছে, সে ঐ ফল সম্বন্ধে শ্রীহট্টকে অদ্বিতীয় স্থান বলিয়া মনে করিবে। এই চিন্তায় মনে মনে শ্রীহট্টের লোক বলিয়া একটু অহঙ্কার হইত,—কিন্তু বম্বের লেবু খাইয়া সে অহঙ্কার চূর্ণ হইল। এখানকার লেবুর শ্রীহট্টের লেবুর উপরে প্রাধান্য এই যে শ্রীহট্টের লেবু কেবল শীতকালে পাওয়া যায়, এখানকার লেবু শীত গ্রীষ্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত বৎসর পাওয়া যায়।

ফলের বাজার ছাড়াইয়া মাছমাংসের বাজারে গেলাম। কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজারের মাংস ও মাছের দোকানে যেমন মার্‌বেল পাথরের টেবিল আছে, এখানে তাহা নাই এবং এখানকার মাছ মাংসের বাজার সেখানকার বাজার হইতে অনেকটা অপরিষ্কৃত। মাংসের বাজারে দেখিবার কিছুই নাই—তোমার জানিবার উপযুক্ত কিছুই নাই। কেবল এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে এখানে মাংসের সের।০ চারি আনা হইতে ।৴০ ছয় আনা পর্য্যন্ত। মাছের বাজারে দেখিবার কিছু আছে—তাহা সমুদ্রের মাছ। এ খানে যত মাছ সকলি সমুদ্রের। জেলেরা যে কি সাহসে

প্রাণ বাঁধিয়া অকূল ও তরঙ্গায়িত সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া মাছ ধরিতে যায়, তাহা ভাবিলেও প্রাণ—বিশেষতঃ ভীরু বাঙ্গালীর প্রাণ—শিহরিয়া উঠে। মাছের বিশেষ বর্ণনা করিতে পারিব না, তবে একরকম মাছ দেখিলাম যাহা তোমায় বলা উচিত। ইংরাজীতে এগুলিকে ফ্লাইং ফিশ (Flying Fish) বলে। ইহাদের ডানা আছে, এবং জল হইতে উঠিয়া, কতকদূর পর্য্যন্ত ডানার উপর ভর করিয়া, ইহারা উড়িয়া গিয়া আবার জলে প্রবেশ করে। ইহাদের খুব লম্বা লম্বা লেজ থাকে। এইরূপ মাছ বাজারে কেবল একটী মাত্র দেখিলাম। ইহাদের স্বাদ কিরূপ, তাহা জানি না। বম্বেতে আরও অনেক বস্তু দেখিবার আছে।

বর্ণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইথারের এইরূপ বিকম্পনবৈচিত্র্যানুসারে বিভিন্ন বর্ণের আলোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সকল প্রকার বিকম্পন একত্র সমবেত হইলে শ্বেতবর্ণের আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের আলোকে এই সকল বর্ণের আলোক বিমিশ্র-ভাবে অবস্থিতি করে। আমরা কৌশল করিয়া শ্বেত বর্ণের আলোককে ইহার উপাদানভূত বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করিতে পারি এবং এইসকল বিভিন্ন বর্ণ একত্রিত করিয়া শ্বেত বর্ণের উৎপত্তি করিতে পারি।

সূর্য্যালোক শ্বেত বর্ণ, ম্যাগনিসিয়ম্ নামে একপ্রকার ধাতু আছে তাহা দগ্ধ করিলে অতি পরিষ্কার শ্বেতবর্ণের আলোক উৎপন্ন হয়; এক খণ্ড চূণ দহ্যমান অম্ল-জল-জান বাষ্পের উৎকট উত্তাপে ধরিলে শ্বেতবর্ণের আলোক উৎপাদন করে এবং অন্যান্য উপায়েও শ্বেতালোক পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক ইহাদের মধ্যে সূর্য্যালোক সহজে প্রাপ্য, অতএব সকলেই ইহা লইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

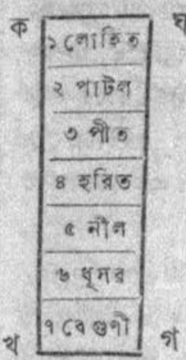
দিবাভাগে একটি গৃহের দ্বার জানালা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া গাঢ় অন্ধকার করিবে, কেবল একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের অত্যল্প

কিরণ আসিতে দিবে, এবং ত্রিপলবিশিষ্ট এক কাচ খণ্ডের [১ম চিত্র] অগ্রভাগের মধ্যদিয়া এই আলোক যাইতে দিবে ; এবং সেই আলোক



১ম চিত্র

সম্মুখস্থ দেয়ালে অথবা একখানি পর্দা টাঙ্গাইয়া তাহার উপর পড়িতে দিবে। তাহাহইলে দেখিবে সূর্য্যের শ্বেতালোকের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় চিত্রের অনুরূপ একটী নানা বর্ণের আলোকের পেটি উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পেটিতে নিম্ন লিখিত সাতটী বর্ণ যথাক্রমে



২য় চিত্র

দৃষ্ট হইবে ; (১) লোহিত ; (২) পাটল ; (৩) পীত ; (৪) হরিত ; (৫) নীল ; (৬) ধূসর ; (৭) বেগুনী। এই সপ্ত বর্ণের আলোক-পেটিকে ইংরাজীতে স্পেক্ট্রম,(Spectrum) কহে। বঙ্গভাষায় ইহাকে বর্ণফল বলা যাইতে পারে।

রামধনুতেও এই সাত বর্ণ যথাক্রমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জলবিন্দু সমূহে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া যে রামধনুর সৃষ্টি হয় তাহা বোধহয় পাঠিকাগণ অবগত আছেন, অতএব রামধনুর রঙ্গের সহিত উক্ত বর্ণফলের রঙ্গের ঐক্য হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

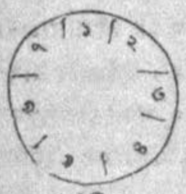
যেরূপ শ্বেত বর্ণের আলোক হইতে উক্ত সপ্ত বর্ণের আলোক পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত সপ্তবর্ণের আলোক একত্রিত করিলেও শ্বেতালোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উহা এইরূপে পরীক্ষা করা যাইতে পারে : পূর্ব্বোক্ত বর্ণফলকে একবারে দেয়ালে বা পর্দ্দায় না ফেলিয়া একখানি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িতে দাও। ঐ প্রতিবিম্ব অবিকল প্রথম বর্ণ ফলের অনুরূপ হইবে। এখন ক খ রেখা যে ভাবে লম্বমান, ঐ দর্পণকে সেইদিকে এরূপ ভাবে নাড়িতে থাক যেন বর্ণফলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণ গুলি একের উপর আর একটি পড়িয়া মিশিয়া যাইতে পারে। এইভাবে অত্যন্ত বেগে নাড়িলে দেখা যাইবে সপ্তবর্ণের পেটীর পরিবর্ত্তে কেবল শ্বেতবর্ণের একটি পেটী উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যদি ওরূপভাবে না নাড়িয়া খ গ রেখার অনুযায়ী নাড়া যায়, তাহা হইলে শ্বেতালোকের উৎপত্তি হইবে না। কেবল ঐ পেটী তৃতীয় চিত্রের অনুরূপ আরও চৌড়া দেখা

পাইবে; যেহেতু এমন করিয়া নাড়িলে সাতটী বর্ণ একত্র মিশিতে পাইবে না, স্বতন্ত্রই থাকিবে।



৩য় চিত্র

অন্যরূপেও ইহা পরীক্ষা হইতে পারে, যথাঃ— একখানি পুরু তাসের কাগজ অথবা পাতলা তক্তা গোল করিয়া কাটিয়া তাহাতে বর্ণফলের পর্য্যায়-ক্রমে [৪র্থ চিত্র] লোহিত পাটল ইত্যাদি সাতটি বর্ণ চিত্রিত কর এবং কেন্দ্র স্থির রাখিয়া চক্রখানি বেগে ঘুরাও। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ঐ বিভিন্ন বর্ণ মিলিয়া কেবল শ্বেত বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ এবং অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে শ্বেতবর্ণ বর্ণফলের সাতটী স্বতন্ত্র বর্ণ একত্র সমাবিষ্ট হইয়া জন্মে।



৪র্থ চিত্র

বর্ণফলে যে সাতটি বর্ণ আছে তন্মধ্যে লোহিত পীত ও নীল এই তিন বর্ণকে মূলবর্ণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু এই বর্ণগুলি স্বতন্ত্র ও স্ব-ভাব বিশিষ্ট, কিন্তু অপর গুলি সেরূপ নহে। পাটল লোহিত ও পীতের মধ্যবর্ত্তী, ইহাতে ঐ উভয়েরই আভা বর্ত্তমান আছে। সেইরূপ পীত ও নীলের সমবায়ে হরিত এবং নীল ও লোহিতের সমবায়ে বেগুণীর উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে যে কোন বর্ণের আলোক হইতে পারে, তাহা এই কয়েকটীর সমবায় মাত্র। কৃষ্ণ কোনও স্বতন্ত্র বর্ণ নহে; ইহা অন্ধকারের প্রতিরূপ মাত্র। আলোকের অভাবই অন্ধকার।

(ক্রমশঃ)

কৌতুক কথা।

১। এক দিবস ইউরোপীয় কোন সুবিখ্যাত রাজ্ঞী কোন সেনাপতির রণকৌশলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "সেনাপতে! তোমার রণদক্ষতায় আমি একান্ত মোহিত হইয়াছি; যে রমণী তোমার মন হরণ করিয়াছে, সেই জগতে ধন্য ও সুখী। তোমার প্রণয়িনীকে একবার দেখিতে

আমার বড় সাধ হইয়াছে।" সেনাপতি উত্তর করিলেন, "আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি কাহাকেও তাহার নাম বলি নাই, সেখানত পরের কথা। তবে যখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, আগামী কল্য আমি তাহার প্রতিমূর্ত্তি পাঠাইয়া দিব।" রাজ্ঞী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরদিবস বস্ত্রাবৃত প্রতিমূর্ত্তি আসিবা মাত্র রাজ্ঞী খুলিয়া দেখেন, যে, প্রতিমূর্ত্তি নাই, একখানি দর্পণ মাত্র; তাহাতে তাঁহার নিজেরই প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়াছে। রাজ্ঞী সেনাপতির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

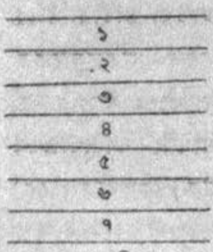
২। জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার স্বামীকে পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী দেখিয়া বলিল, "নাথ! আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, আমি পুস্তক হই; তাহা হইলে সারাদিন তোমার হাতে হাতে থাকিতে পাইব।" স্বামী বলিল, "পুস্তক হওত পঞ্জিকা হইও, বৎসর বৎসর নূতন হইবে।"

৩। ইউরোপের কোন কোন দেশে পূর্ব্বে এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার করিলে সে পাপের ক্ষালন হয়। একদা একটী স্ত্রীলোক তাহার পুরোহিতের নিকট আপনার পাপকার্য্য স্বীকার করিতে গিয়াছিল। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "মহাশয় আমার নামে কোন পাপ নাই।"

৪। একজন অর্দ্ধপণ্ডিত বলেন, "প্রাণ থাকিতে বিবাহ করিও না; বিবাহ করিলে তোমার স্ত্রী, হয় মহৎকুলোদ্ভব হইবে, নতুবা নীচ কুলোদ্ভব হইবে, হয় ধনী হইবে, নতুবা দরিদ্র হইবে। মহৎকুলোদ্ভবা হইলে ভাব দেখি সে কত অহঙ্কারী হইবে! নীচ কুলোদ্ভবা হইলে ভাব দেখি তোমার কত মান হানি! পণ্ডিত হইলে তুমি তাহার কাছে তৃণবৎ হইবে; মূর্খ হইলে তোমার কোন উপকারেই আসিবে না; ধনী হইলে সে তোমাকে দাসবৎ আচরণ করিবে; দরিদ্র হইলে তোমার বিপদ কালে তাহার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও সাহায্য পাইবে না।

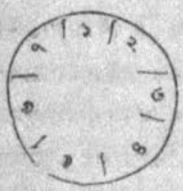
৫। এক জন কাবেলী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক পাটী জুতা পাইয়া তাহা পায়ে দিয়া চলিতেছিল। জনৈক স্ত্রীলোক তাহার এক পায়ে জুতা দেখিয়া পরিহাস করিয়া তাহার সঙ্গিনীকে বলিল, "দেখ, এক পায়ে

হইবে; যেহেতু এমন করিয়া নাড়িলে সাতটী বর্ণ একত্র মিশিতে পাইবে না, স্বতন্ত্রই থাকিবে।



৩য় চিত্র

অন্যরূপেও ইহা পরীক্ষা হইতে পারে, যথাঃ— একখানি পুরু তাসের কাগজ অথবা পাতলা তক্তা গোল করিয়া কাটিয়া তাহাতে বর্ণফলের পর্য্যায়-ক্রমে [৪র্থ চিত্র] লোহিত পাটল ইত্যাদি সাতটি বর্ণ চিত্রিত কর এবং কেন্দ্র স্থির রাখিয়া চক্রখানি বেগে ঘুরাও। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ঐ বিভিন্ন বর্ণ মিলিয়া কেবল শ্বেত বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ এবং অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে শ্বেতবর্ণ বর্ণফলের সাতটী স্বতন্ত্র বর্ণ একত্র সমাবিষ্ট হইয়া জন্মে।



৪র্থ চিত্র

বর্ণফলে যে সাতটি বর্ণ আছে তন্মধ্যে লোহিত পীত ও নীল এই তিন বর্ণকে মূলবর্ণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু এই বর্ণগুলি স্বতন্ত্র ও স্ব-ভাব বিশিষ্ট, কিন্তু অপর গুলি সেরূপ নহে। পাটল লোহিত ও পীতের মধ্যবর্ত্তী, ইহাতে ঐ উভয়েরই আভা বর্ত্তমান আছে। সেইরূপ পীত ও নীলের সমবায়ে হরিত এবং নীল ও লোহিতের সমবায়ে বেগুণীর উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে যে কোন বর্ণের আলোক হইতে পারে, তাহা এই কয়েকটীর সমবায় মাত্র। কৃষ্ণ কোনও স্বতন্ত্র বর্ণ নহে; ইহা অন্ধকারের প্রতিরূপ মাত্র। আলোকের অভাবই অন্ধকার।

(ক্রমশঃ)

কৌতুক কথা।

১। এক দিবস ইউরোপীয় কোন সুবিখ্যাত রাজ্ঞী কোন সেনাপতির রণকৌশলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "সেনাপতে! তোমার রণদক্ষতায় আমি একান্ত মোহিত হইয়াছি; যে রমণী তোমার মন হরণ করিয়াছে, সেই জগতে ধন্য ও সুখী। তোমার প্রণয়িনীকে একবার দেখিতে

আমার বড় সাধ হইয়াছে।" সেনাপতি উত্তর করিলেন, "আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি কাহাকেও তাহার নাম বলি নাই, সেখানত পরের কথা। তবে যখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, আগামী কল্য আমি তাহার প্রতিমূর্ত্তি পাঠাইয়া দিব।" রাজ্ঞী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরদিবস বস্ত্রাবৃত প্রতিমূর্ত্তি আসিবা মাত্র রাজ্ঞী খুলিয়া দেখেন, যে, প্রতিমূর্ত্তি নাই, একখানি দর্পণ মাত্র; তাহাতে তাঁহার নিজেরই প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়াছে। রাজ্ঞী সেনাপতির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

২। জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার স্বামীকে পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী দেখিয়া বলিল, "নাথ! আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, আমি পুস্তক হই; তাহা হইলে সারাদিন তোমার হাতে হাতে থাকিতে পাইব।" স্বামী বলিল, "পুস্তক হওত পঞ্জিকা হইও, বৎসর বৎসর নূতন হইবে।"

৩। ইউরোপের কোন কোন দেশে পূর্ব্বে এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার করিলে সে পাপের ক্ষালন হয়। একদা একটী স্ত্রীলোক তাহার পুরোহিতের নিকট আপনার পাপকার্য্য স্বীকার করিতে গিয়াছিল। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "মহাশয় আমার নামে কোন পাপ নাই।"

৪। একজন অর্দ্ধপণ্ডিত বলেন, "প্রাণ থাকিতে বিবাহ করিও না; বিবাহ করিলে তোমার স্ত্রী, হয় মহৎকুলোদ্ভব হইবে, নতুবা নীচ কুলোদ্ভব হইবে, হয় ধনী হইবে, নতুবা দরিদ্র হইবে। মহৎকুলোদ্ভবা হইলে ভাব দেখি সে কত অহঙ্কারী হইবে! নীচ কুলোদ্ভবা হইলে ভাব দেখি তোমার কত মান হানি! পণ্ডিত হইলে তুমি তাহার কাছে তৃণবৎ হইবে; মূর্খ হইলে তোমার কোন উপকারেই আসিবে না; ধনী হইলে সে তোমাকে দাসবৎ আচরণ করিবে; দরিদ্র হইলে তোমার বিপদ কালে তাহার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও সাহায্য পাইবে না।

৫। এক জন কাবেলী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক পাটী জুতা পাইয়া তাহা পায়ে দিয়া চলিতেছিল। জনৈক স্ত্রীলোক তাহার এক পায়ে জুতা দেখিয়া পরিহাস করিয়া তাহার সঙ্গিনীকে বলিল, "দেখ, এক পায়ে

জুতা।" কাবেলী শুনিতে পাইয়া উত্তর করিল, "হামারাতো এক পায়ে হ্যায়, তোমারাতো দু পায়ে নেই হ্যায়"

৬। জনৈক স্ত্রীলোক তাহার মূর্খ স্বামীর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "চল চল বাড়ীতে চল, আমার গোপালকে সাপে কামড়েছে।" মূর্খ বলিল "অ্যাঁ কোথায় কামড়েছে?" স্ত্রী বলিল "পায়ে।" স্বামী বলিল, "আঃ বাঁচলেম, প্রাণে ধড় এল, চক্ষু দুটী ত আছে?"

৭। জনৈক রাজা তাঁহার একজন সৈনাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সৈনাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা কে?" সৈনাধ্যক্ষ বলিল, "আজ্ঞে মোহনলাল দ্বিতীয়।" রাজা বুঝিতে পারিলেন, যে সৈন্যাধ্যক্ষ আপনাকেই প্রথম বলিতেছে।

নূতন সংবাদ।

১। গবর্ণর জেনারল লর্ড রিপণের সহধর্ম্মিণী একজন অতি দয়াশীলা রমণী। তিনি সম্প্রতি সিমলা পাহাড়ের অনাথাশ্রমবাসীদিগকে একটী ভোজ দিয়াছেন।

২। পুটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী ভারত-সভার সাহায্যার্থে এককালীন ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

৩। সম্প্রতি মান্দ্রাজে ১৩শ বর্ষীয়া একটী ব্রাহ্মণ বিধবার বিবাহ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ২ মাসের মধ্যে ৫টী বিধবা বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৪। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ডবলিনের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের কন্যা কুমারী লী মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছেন। তাঁহার শিক্ষক মৃত্যুকালে তাঁহাকে এই অনুরোধ করিয়া যান।

৫। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। মহারাণী যেমন সদাশয়া ও উদার-হৃদয়া, ইনি তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন। আমরা আশা করি নূতন দেওয়ানজী ইহাঁর ন্যায় যোগ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের সুখ্যাতিভাজন হইবেন।

৬। শুনা যায় ট্যানার নামক এক সাহেব ২ মাস উপবাস করিয়াও জীবিত আছেন, এই বার তিন মাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

সময়। *

সময় অমূল্য ধন, ইহা প্রায় অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু কিপ্রকারে যে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা কয় ব্যক্তি চিন্তা করেন?

সময় জীবনের অংশমাত্র। যেমন প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, সেইরূপ আমাদের এই জীবনও কতিপয় দিবসের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন পদার্থের যেরূপ একটী মাত্র পরমাণুরও স্খলন হইলে তাহার কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়, সেইরূপ অতি অল্পতম সময়ও অতীত হইয়া গেলে আমাদের এই প্রিয়তম জীবনেরই কিয়দংশ ক্ষয় হয়। এইজন্য পণ্ডিতেরা বলেন যে এমন বহুমূল্য সময় বৃথা ক্ষেপণ করা ও নিজ জীবনকে ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করা উভয়ই তুল্য।

আমরা সর্ব্বদাই প্রায় এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকি যে "আমার সময় নাই" কিন্তু সময় যে কেন নাই তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা সময়ের ব্যবহার জানি না বলিয়াই যে আমাদের নিকট সময় এত অল্প বলিয়া বোধ হয় তাহা ভ্রমেও ভাবিনা। সত্য কথা বলিতে কি আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাস্তবিক কয়ঘণ্টা কার্য্যে নিযুক্ত থাকি? যে বুদ্ধিমান সময়ের সদ্ব্যবহার জানেন, তাঁহার নিকট অল্প সময়ও দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যত কার্য্য করেন, অন্যলোকে তাহার চতুর্গুণ সময়েও তত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

যদিও দেশীয় জলবায়ু এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা আমাদিগকে শ্রমকাতর করিবার যথেষ্ট কারণ বটে, কিন্তু শিক্ষার দোষ যে সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। যে হেতু শৈশব হইতে সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা না করিলে মনুষ্য কখনই ভবিষ্যতে শ্রমক্ষম ও কার্য্যকুশল হইতে পারে না। অতএব প্রত্যেক জননীর কর্ত্তব্য তাঁহার সন্তানগণকে শিশুকাল হইতেই সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেন এবং নিজেও সেইমত কার্য্য করেন। নতুবা তিনি যদি স্বয়ং শ্রমকাতরা ও অনর্থক সময় যাপনে অনুরাগিণী থাকিয়া

* বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশনে পঠিত।

পুত্র কন্যাকে কেবল মুখে পরিশ্রমী হইতে বলেন, তাহাহইলে তাঁহার সেই বাক্য ছিন্নবৃক্ষ মূলে জল সেচনের ন্যায় কোন কার্য্যেরই হয় না। সেই পুত্রকন্যা আপন মাতার উপদেশ অপেক্ষা তাঁহার আচরণই যে অবিলম্বে শিক্ষা করে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, যেহেতু উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই সর্ব্বস্থানে অধিক কার্য্যকারী।

মাতা যেরূপ প্রকৃতির হয়েন, তাঁহার সন্তানও যে তদনুরূপ হয় ইহা কে না স্বীকার করিবেন? মনিকার ন্যায় ধার্ম্মিকা মাতা না পাইলে আগষ্টিন কি কখন তাদৃশ দেবজীবন লাভ করিতে সক্ষম হইতেন? স্বদেশ হিতৈষিণী কর্নিলিয়ার পুত্র না হইলে গ্র্যাকাই নামক ভ্রাতৃদ্বয় জন্মভূমি রক্ষা হেতু কি জীবন দানে সাহস পাইতেন? কখনই না।

অতএব জননীর গুণেই যে সন্তানগণ সৎ হয়, এবং তাঁহার চরিত্রই যে তাহাদের একমাত্র আদর্শ ইহা বলা কেবল বাহুল্য। কারণ মানব প্রকৃতি কিছু মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলেই এই বাক্যের সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে।

এক্ষণে সময়ের সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা এইসদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রকৃত অর্থ এই যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে সময়কে নিয়োগ করা। যাহা কিছু আমাদের বিবেক-সম্মত, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা যে আহার করি, নিদ্রা যাই, সন্তান পালন করি, গৃহকার্য্য দেখি বা অন্যান্য কার্য্য করি, নিশ্চয়ই এইসকল কার্য্য পরোপকার, উপকারীর প্রত্যুপকার, গুরুজনের সেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যের ন্যায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এ নিমিত্ত বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সকল কার্য্যে উপযুক্ত সময় নিয়োগ করিলে কখনই সময়ের অপব্যবহার করা হয় না। তবে যদি কোন ব্যক্তির ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেই যথেষ্ট শরীর সুস্থ থাকে, কিন্তু সে আলস্যের বশীভূত হইয়া আরও দুই ঘণ্টা অধিক নিদ্রা যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ অতিরিক্ত দুইঘণ্টা তাহার অপব্যয় করা হয়, সেইরূপ যে কোন সময় আমরা ঈশ্বরাভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপণ করি সেই সময়টিই আমাদের বৃথা নষ্ট করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত মধ্যে মধ্যে আত্ম-চিন্তায় নিযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ আমি কতদিনের জন্য এ সংসারে আসিয়াছি, কি লইয়াই বা পরলোকে গমন করিব এবং আমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কি? এই সকল বিষয় স্থিরচিত্তে চিন্তা করা। কারণ এইরূপে আত্ম-চিন্তা করিলে মানবজীবন যে ক্ষণস্থায়ী ও ঈশ্বরলাভই যে তাহার এক মাত্র লক্ষ্য ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতীতি হইতে পারিবে এবং তাহাহইলে এই অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে নিশ্চয়ই যে আপনা হইতে অভিলাষ জন্মিবে তাহতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তৃতীয়তঃ, কার্য্য সকল শৃঙ্খলাপূর্ব্বক করিবার জন্য সময়ের বিভাগ করা। কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে তাহা স্থির থাকিলে সকল কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় এবং সময়েরও অপব্যয় হয় না। এই পৃথিবীতে যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রায় কার্য্যের কোন না কোন প্রকার নিয়ম ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যে হেতু নিয়মপূর্ব্বক না চলিলে এই ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনে কর্ত্তব্য সকল পালন করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের অধিপতি রাজা আলফ্রেড্ যাঁহার নাম এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার স্বদেশবাসীগণের অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, তিনি নিয়মপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া নিজের ও নিজ রাজ্যের কি পর্য্যন্ত না কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন!

উক্ত মহাত্মা দিন ও রাত্রিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া একাংশ ঈশ্বরোপাসনা ও অধ্যয়ন, অপরাংশ রাজকার্য্য ও স্বদেশোন্নতি এবং অবশিষ্টাংশ আহার নিদ্রা ও ব্যায়ামে অতিবাহিত করিতেন। আমার বিবেচনায় গৃহিণীগণ নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে চলিতে পারিলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম হইতে পারেন।

নিদ্রা ৭ ঘণ্টা, স্নান আহার প্রভৃতি ৩ ঘণ্টা, গৃহকার্য্য, সন্তান পালন ও তাহাদের শিক্ষাদান ৭ঘণ্টা, ঈশ্বর চিন্তা জ্ঞানচর্চ্চা ও অন্যান্য সৎকার্য্য ৭ঘণ্টা।

চতুর্থতঃ, সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে গেলে অবকাশকালে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। কারণ এই সময়ই পাপ ও পুণ্য উভয় পথের মধ্যস্থল। মনুষ্য এইসময়ে যেরূপ চরিত্রশোধন ও আত্মোন্নতি সাধনে সক্ষম হইতে